

সাহিত্য বাগ

প্রথম প্রকাশ । ১৯৩০

প্রকাশক । রমা ভট্টাচার্য

২৬ সেন্ট্রাল রোড

কলকাতা-৭০০ ০০২

মুদ্রক । ঐনিশিরকুমার সরকার । ভাবা প্রেস

২০বি, কুমার সরকার লেন । কলকাতা-৭০০ ০০৭

କବି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ

ଅଗ୍ରଜ୍ୟୋତିର୍ବିଷ୍ଣୁ—



ভারতীয় থিয়েটারে গত দশ-বারো বছরে যে বেরটোল্ট্‌ ব্রেন্‌ট্‌-কে সাক্ষরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তিনি সর্বনীতিবিশিষ্ট সুযোগ-সন্ধান ও সুবিধাবাদের প্রবক্তা। তাঁর নাটকের প্রয়োগ প্রায়শই বাবু-বিলাসী প্রমোদসর্ব্ব্ব ; থিয়েটারের যে উপকরণগুলি ব্রেন্‌ট্‌ শাণিত করে তুলেছিলেন সমাজসংশোধনের অন্তরঙ্গ, সেগুলি এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পগত দুর্বলতা তথা অপারগতার শৈথিল্যে জীর্ণ। হু'একটি ব্যতিক্রমে যক পরিকল্পনা কিংবা সাম্প্রতিক সম্পদে কিংবা দেশজ রীতির সঙ্গে মেলবন্ধনে উত্তরণ ঘটলেও ব্রেন্‌ট্‌-এর সমাজ-চিন্তার জটিল সমগ্রতা এই থিয়েটারে উন্মোচিত হয়নি বললেই চলে। ব্রেন্‌ট্‌, যে তাঁর থিয়েটারে ধনতান্ত্রিক ব্যবহার অন্তর্নিহিত দুর্নীতি প্রকাশ করেন, এই ব্যবহার উচ্চের দাবি করেন, তারই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুব্যক্ত পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নৃকোয়া নিয়মনীতি অধীকারেও উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতকে একটা পরিহাসের স্তরে নামিয়ে এনে যখন নীতিবোধ পরিহার করাতাই একটা নব মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করা হয়, তখন ব্রেন্‌ট্‌-কে নিছক সুবিধাবাদের ধর্মশাক্তী ঠাঙ করােনো হয়। 'থিয়েটারি অপেরা' থেকে 'লাইক অফ গ্যালিলিও' পর্যন্ত নাটক নির্বাচনে, নাটক সম্পাদনায় এবং প্রযোজনায় এই বিশালজনক প্রবণতা এতটাই স্পষ্ট যে তার পাশে ব্যতিক্রমগুলি প্রায় চারিয়েই যায়। অর্থাৎ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনে অহরহ যে আপসরকার আমরা নিরঙ্কিত তারই সমর্থক করে তুলি আমরা বেরটোল্ট্‌ ব্রেন্‌ট্‌কে, তাঁকে দিয়ে যেন আমরা বলিয়ে নিতে চাই, 'যেতেতু এই সমাজ-ব্যবস্থাটাই অস্তর, তোমাদের ব্যবস্তার নীতিহীন অস্তর কর্বকাওই সমর্থনযোগ্য।' অন্যায় সমাজব্যবহার চাপে মানবসমাজের নৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে দেখে আমাদের আতঙ্কিত হবার কথা, অথচ আমাদের থিয়েটারে তা-ই হয়ে ওঠে আনন্দোন্মাদের উপলব্ধি, নাচে-গানে রঙচঙে হয়ে ওঠে অবশ্যের ভঙ্গাবহ ছবি।

১৯৪৯ সালে ব্রেন্‌ট্‌ যখন গল্প ও কবিতার এই সংকলনটি প্রকাশ করেন, তখন কি তাঁরও মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তাঁর জটিল, 'আন্তরিক' সমাজ-চিন্তাকে এইভাবে বিকৃত করে তাঁরই বিকড়ে তা প্রয়োগ করতে পারে তাঁর

কল্পনক ? যাকি বুঝেঁরা ভগবতের প্রবোধনার তিনি কখনই দেখতে ভুল
 করেছেন এই অব্যবহিক সরলীকরণ ? আর তাই কি তিনি পার্থক্য-বর্ণকবের
 কাছে কিরিয়ে আনেন এক বলিষ্ঠ, আপসহীন মানবিকবোধ ? ক্যালেনডার-
 কাহিনীগুলির একটিকেও কেউ নিজেকে আপনের জীবিতার বাহারনি ;
 বিষয়ের সত্যতার শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখা সহজ হয় না, তবু সেই সত্যতা থেকে
 বিচ্যুত হল না ব্রেন্‌ট-এর প্রায় কুশীলবেরা । যুদ্ধক্ষেত্রে পালাতে গিয়ে কাটার
 ছোপে পায়ে কাটা বিধে অচল হয়ে পড়ে প্রাণল সোরগোল তুলে পার্থক্য
 কাহিনীকে বিজ্ঞাত ও চিত্রিত করে দিয়ে সজ্জিতস যীরের সম্মান পেয়ে গিয়েও
 সেই বিখ্যা সম্মান যেনে নেন না । যেনে নেন না, বরং সম্মানস্বক
 আলকিবিয়াহিসকে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়েও দেন ; আর কোনো কারণে নয়,
 কেবলমাত্র স্বী কৃসানতিপি-র কাছে চিরজীবন বিখ্যাংকী হয়ে থাকতে
 পারবেন না বলে । ক্যালেনডার-কাহিনীর পাতার ইতিহাসের যে ছবি
 উন্মোচিত হয়, তাতে প্রায় মিনেহার মতো ভেসে ওঠে ত্রিশ বছরের যুদ্ধের
 ভাষাভোলের মধ্যে যখন নিঃসর চামড়া বীচাবার আত্যাত্তিক আগ্রহে সাধারণ
 মানবিক সম্পর্কগুলি শিথিল হয়ে যায়, তখন আবার সেই সম্পর্কের অগ্নান
 মূল্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে আনা নামে ধনীমূহের পরিচায়িকা যেহেটি এবং
 আউগ্‌সবুর্গের জনপ্রিয় বিচারক ইগন্যাৎস ডোলিয়ার ; বেকনের বিজ্ঞানস-
 নতিত্বা উত্তরাধিকার হয়ে থাকে তাঁর পরিচায়ক-সঙ্গী ছেলেটির কাছে ,
 জিওরহানো জনো বন্দী হশাতেও তুলতে পারেন না সেই হজিবউটিকে যার
 স্বাধীর তৈরি করে দেওয়া কোটের দাম তিনি বন্দী হবার আগে মিটিয়ে
 আসতে পারেননি । ইয়োয়োগির নবজাগৃতির মধ্যে থেকে পরিবর্তনের যে
 চেতনা উৎসারিত হয়েছিল, তা বিজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজ, সবদুয়েই ছড়িয়ে
 বেড়ান । জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে তা স্পর্শ করতে পারেনি । কিন্তু
 ব্রেন্‌ট-এর মধ্যযুগ-নবজাগৃতির গল্পগুলিতে জনসাধারণের প্রাত্যাহিক জীবনের
 সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রবণতাগুলির যোগই নবজাগৃতির জীবনধর্মকে অস্ত মাত্রা
 দেয় । পরবর্তীকালের বুঝেঁরা মূল্যবোধ এই জীবনধর্মকে ভেঙেছে, ভাঙতে
 ভাঙতে তাকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে ।
 তাই নবজাগৃতির উদার, বিজ্ঞানধর্মী মানবিকতার পাশাপাশি একাধিক গল্প-
 কবিতার আসে ক্যানিবার ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কখনও ব্যদের দ্বারা
 আবৃত, কখনও বা তারই মধ্যে অসম সাহসে বেগে ওঠে মানবধর্মের আত্ম-
 বোধনা, যেমন ছোটদের ক্রুসেডমাত্রার বিবরণে ।

একমাত্র সীতার ও তাঁর সেনাবাহিনীর গল্পটিতেই রেন্স্ট-এর বহুলবক্তব্য নাটকগুলির জটিলতার বাব খানিকটা পাওয়া যায়। গল্পরচনার কারিগরিতেও সবরের পূর্ণাঙ্গরতা নিয়ে যে খেলা আছে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের নাটকীয় মুহূর্তে সমাজের বহু স্তরে, রৌর শহরের একাধিক অঞ্চলে ঘটনা-প্রত্যয়ে বিকৃত করে বেওয়ারি যথো যে বিস্তারের সূক্তি আছে তা একাধারে নাটকীয় ও আখ্যানবর্ধে সমৃদ্ধ। রেন্স্ট শেক্সপীয়ার ও এলিজাবেথিয় যুগের নাট্যকারদের ভক্ত সাধক ছিলেন। শেক্সপীয়ারের ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটক তাঁর পড়া ছিল। শেক্সপীয়ারের নাটকের সবচেয়ে উদ্ভেজনাময় মুহূর্তটি যখন তিনি যেন অনেক দূর থেকে কাপসা দেখা এক অনতিমূল্যবান দৃশ্যে পরিণত করেন, রাজ হু তিনিটি থাকোর অহুৎসাচে, তখন শেক্সপীয়ারের রচিত দৃশ্যটি যেমন স্বরণে আসে, তেমনি তার অবমূল্যায়ন—না কি অবমূল্যায়নও—ঘটে যায়।

ক্যালেনডার-কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ হের করনারের বাণীর লংগ্রহ। ডালটার বেনইয়ামিন বলেন : ‘হের করনার নিবিস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি, কিন্তু হুয়াবান সমাজসেবীরা যে আদর্শ নিবিস্ত করনা করেন, তার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। তাঁকে ভিতর থেকে দেখানো হয় না। তিনি আপা করেন, হারিত্রা তাঁকে যে দৃষ্টিকোণে জোর করে পৌছে দিয়েছে, তারই সূক্তিবাহী বিকাশের কথা দিয়ে দুঃখদুর্দশার অবসুপ্ত ঘটানো যাবে।... তাঁর বাণীর প্রথম প্রতিক্রিয়া শিক্ষাব্যক্তক, দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রনৈতিক, এবং শেষতম প্রতিক্রিয়া কাব্যগুণায়ক।’ করনারের কথার তাই বারবার থরকে ঠাড়াতে হয়, ভাবতে হয় ; তবেই অভিজ্ঞতার সহজাত শিক্ষা থেকে প্রজ্ঞার সূরিতে উত্তরণের নির্দিষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। করনারের শেষ বাণীর সঙ্গে রেন্স্ট-এর অভ্যন্ত প্রিয় সেই মার্কসিয় উচ্চারণের যোগ হুস্পটে। বহুদিন পরে দেখা দিতে জনৈক বন্ধু করনারকে বলেন : ‘তুমি এতটুকু পালটাও নি।’ ‘ও!’ বলে করনার বিবর্ণ হয়ে যান। মার্কস বলেছিলেন, অতীতের দার্শনিকেরা কেবল পৃথিবীর ব্যাখ্যাই করেছেন ; আমাদের দায় তাকে পালটানো। এবং রেন্স্ট জানতেন, এই পালটারো শুরু হয় যখন মাহুৎস্নিকেকে পালটাতে শুরু করে, সমাজকে পালটানোর দায় বনে রেখে। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অহুৎস্ন, অস্বাভাবিক মূল্যবোধকে অটল, অগ্রর আত্মসমর্পণে যেনে নেওয়ার রানি থেকে অন্য বিশ্বাসের শক্তিতে মাহুৎস্নকে পৌছে বেওয়ার দায় রেন্স্ট, তাঁর দায় বলে যেনে যেন ক্যালেনডার-কাহিনীর সহজ তাৎপর্যবরতার।



ଆଠିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର-ମଠ ଶକ୍ତିର ଚକ ୩
 ବିଦ୍ୟାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପାଠ ୪୧
 ଜାତିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରର ମେଠ ମେଠିକ ୧୦
 ଅବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତର ବୁଦ୍ଧି ୨୦

ମେଠ ଚୁଠି ଚେଳେ ୨୦ ଗୁରୁମେଠିକେଠ ୨୦
 ମିଠିଆର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ମେଠିକ ୧୧
 ଆହତ ମେଠିକ ୧୨
 ଗୁରୁର କରମାନ-ମେଠ କାଠିବୀ ୨୦



আউগ্‌সবুর্গ-এর খড়ির চক্র

ত্রিশ বছরের বৃদ্ধ চলা কালে ঐতিহাসিক নারের এক সুইস প্রোটেষ্ট্যান্ট নাগরিকের লেখ-এর ধারের স্বাধীন নগর-নগর আউগ্‌সবুর্গে একটি বড় ট্যানারী সম্বন্ধে চামড়ার ব্যবসা ছিল। লোকটি আউগ্‌সবুর্গের একটি বেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর তাদের একটি বাচ্চা ছিল। যখন ক্যাথলিক সৈন্তরা সেই নগরের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন তার বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতে, কিন্তু তার পরিবারের জন্যই হোক, কিম্বা তার ট্যানারীর কতি হবে ভেবেই হোক, সে সময় মত ঠিক করে উঠতে পারেনি এবং সময় থাকতে পালিয়ে যেতে পারেনি।

তাই যখন ক্যাথলিক সৈন্তরা ঝড়ের মত এসে পড়ল, তখনো সে শহরেই ছিল। আর তারপর সন্ধ্যাবেলায় যখন লুঠ-তরাজ শুরু হল তখন সে উঠোনের এক গর্তের মধ্যে, যেখানে রঙ রাখা হত, তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। কথা ছিল তার স্ত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে শহরের বাইরে আত্মীয়দের কাছে চলে যাবে। কিন্তু, সেই মহিলা তার জিনিস-পত্র, শোশাক-আশাক, গহনা-গাটি আর বিছানা-পত্র গোছ-পাছ করতে বসে বসে সময় নিয়েছিল। কলে চঠাৎ দোতলার জানালা দিয়ে দেখতে গেল কাউজারের একদল সৈন্ত বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সে তখন সব কিছু কলে রেখে পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

এমনি করে বাচ্চাটা সেই বাড়ীতে রয়ে গেল। মৃত এক ঘরে সে তার বোমনার স্তরে একটা কাঠের বল নিয়ে খেলা করছিল। বলটা ছাড়ের থেকে একটা সুতোয় বোলানো ছিল।

সেই বাড়ীতে একজন হান্স-অলব্রয়সী বি তখনো ছিল। সে রাস্তাঘরে তারার বাসন-পত্র গোছ-পাছ করছিল এমন সময় গলিতে হুটগোল শুনে গেল। ছুটে জানালার সারনে গিয়ে দেখল, গলির ওপাশের বাড়ীর দোতলা থেকে সৈন্তরা লুটের সব সামগ্রী গলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছে। সে তখন ছুটে

বাচ্চার খরে গিয়ে বোনদা থেকে বাচ্চাটাকে তুলতে বাবে এমন সময় কার্টের লম্বা দরজার দোর খান্না মারার শব্দ শুনতে গেল। তার ভীষণ ভয় হল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

৯ বাতাল সৈকে বাড়ী-খর বোকাই হয়ে গেল। তারা সব ভেঙে চূরে শুকনুহ করে ফেলল। ওরা জানতো যে ওটা প্রোটেক্টাণ্ট-এর বাড়ী। সেই তরুণি আর খর-দোর ওলটপালট করার পরও সেই বি আন্না আর বাচ্চাটাকে অক্লুত ভাবে রেহাই পেয়ে গেল। সৈকতবল চলে গেলে আন্না যে আলমারিটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দেখে খরে বাচ্চাটার গারে আঁচড়টিও লাগেনি। তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সাবধানে বাইরের উঠানে গেল। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে, কিন্তু পানের একটা জলন্ত বাড়ীর লাল আলো এসে পড়েছে এই উঠানে; সেট আলোর আন্না দেখতে পেল তার মালিকের নীতংল দৃতবেদ। সৈন্যরা তাকে গত্ত থেকে বার করে খুন করেছে।

এতক্ষণে আন্নার খেয়াল হল, প্রোটেক্টাণ্টের বাচ্চালমন্ত যদি সে রাত্তার খরা পড়ে তাহলে তার কি বিপদ হতে পারে। মন চাইছিল না তবুও সে বাচ্চাটাকে আবার হোলনার গুটরে দিল, তাকে একটু দুধ পেতে দিয়ে বোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, সেই শহরের অল্প পাড়ার তার এক বোন থাকত, তার বাড়ীর পথে রওনা হল। রাত দশটা নাগাদ, শহরে বখন সৈকতরা তাদের বিজয় উৎসবে মত্ত, তখন আন্না তার ভগ্নীপতিকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভিড় ঠেলে শহরের বাইরে বাচ্চাটির মা ক্রাউৎসিঙলির খোঁজে বের হল। ওরা একটা মত্ত বাড়ীর দরজার গিয়ে কড়া নাড়ল, অনেকক্ষণ পরে দরজাটা একটুখানি কাক হল। একজন বয়স্ক বেঁটে লোক, ক্রাউৎসিঙলির কাকা তার মাথাটা বার করল। আন্না কুতবাসে বলল, হেরাভুৎসিঙলি মারা গেছে তবে বাচ্চাটার কোনো কতি হয়নি, সে বাড়ীতেই আছে। বয়স্ক লোকটি মাছের মত ঠাণ্ডা চোখে ওদের দেখে বলল, তার ভাইঝি নাকি ওখানে আর নেই, আর প্রোটেক্টাণ্ট-এর বাচ্চার বাপারে তার নিজেরও কোনো উৎসাহ নেই। এই কথা বলে লোকটা আবার দরজা বন্ধ কবে দিল। কিরে বাবার লম্বা আন্নাও ভগ্নীপতি লক্ষ্য করে, একটা জানালার পর্দা নড়ে উঠেছিল এবং সে নিশ্চিত হয় যে ক্রাউৎসিঙলি ওই বাড়ীতে ছিল। বোকা গেল নিজের বাচ্চার নামে এই অপবাদে তার কোনো লক্ষ্য হয়নি।

কিছু সময় আন্না আর তার ভগ্নীপতি চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চলল।

তারপর আরা তার ভরীপড়িকে জানাল যে সে সেই ট্যানারীতে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে চায়। ভরীপড়িটি শাও একড়ির ভালবাস্তব। ওই কথা শুনে শক্তিত হন, চেষ্টা করল আরাকে ঐ ভরফর চিন্তা থেকে বিরত করতে। ওসব লোকেরের সাথে কিই বা সম্পর্ক ছিল তার? তারা তো তার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহারও কখনো করেনি।

আরা চুপ করে সব শুনল, তারপর কথা দিল, অজায় কিছু করবে না। তবে তাকে অতি অবশ্য একবার ট্যানারীতে যেতেই হবে। চাই করে দেখে আসবে বাচ্চাটার কিছু ধরকার আছে কিনা। আর সে একা যেতে চাইল।

আরার ভেদ বজায় বইল। লগুঙও করা বিশাল ঘরের বধ্যাধানে বাচ্চাটা তার হোলনার শান্তভাবে শুয়ে ঘুমোছে। আরা ক্লান্তভাবে তার পাশে বসে দেখছে। আলো আলবার সাহস তার হয়নি, কিন্তু পাশের বাড়ীটা তখনো জলছে। আর সেই আলোতে সে বাচ্চাটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বাচ্চাটার কচি গলায় একটা ছোট্ট স্বর্ণমালা।

বেশ কিছু সময়, বোধহয় একঘণ্টা, কি-টি দেবল বাচ্চাটা কেমন নিঃশব্দ নিচ্ছে আর ছোট্ট হাতের মুঠি চুষছে। সে বুঝতে পারল, বড় বেনী সময় বসা হয়ে গেছে আর বড় বেনী দেখা হয়ে গেছে, এখন আর বাচ্চাটাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না। অতি কষ্টে উঠে পাড়াল, ধীরে হুহু বাচ্চাটাকে একটা চাদর দিয়ে জড়াল, তাকে হাতের মধ্যে তুলে নিল, তারপর তাকে নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে রওনা হল ভয়ে ভয়ে চারদিক দেখতে দেখতে, যেন পা পাকলে লোকে যেমন বায় চোয়ের মত।

বোন আর ভরীপড়ির সঙ্গে অনেক পরামর্শ করার পর হু'লগাহ পরে সে বাচ্চাটাকে গ্রোসআটটিডেন গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তার দাধা চাষের কাজ করে। বাহারবাড়ীটা তার দাধার স্ত্রীর, দাধা সেখানে ঘরজারাই। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, আরা একমাত্র তার দাধাকে বাচ্চাটার আসল খবর হস্ততো দিতে পারে। কারণ তারা সেই চাষী বৌকে কখনো তোখে যেখেনি আর জানতো না, এরকম একটা বিপজ্জনক বাচ্চাকে সে কিতাবে বেবে।

আরা দুপুর নাগাদ সেই গ্রামে পৌঁছল। তার দাধা, দাধার বৌ আর মজুররা তখন খেতে বসেছে। আরাকে ভেমন বায়াপ ভাবে মিল না ওয়া। কিন্তু তার নতুন বৌদির দিকে এক নজর দেখেই বুঝল, বাচ্চাটাকে নিজের

বলতে হবে। তাই যখন সে বলল, তার দাবী হূরের এক গ্রামে একটা পরকনে চাকরি করে আর সেখানে সে বাচ্চা সবচেয়ে আদ্যকে ছুঁচার সন্তাই পরে আশা করছে, তখন সেই চাবী বোঁ হেঁ-হেঁ করে উঠল আর বাচ্চাটাও বাতাবিক গ্রন্থনা পেল।

বিকলে আদ্য তার দাবীর সঙ্গে বনে গেল কাঠ আনতে। ওরা একটা গাছের ওঁড়ির ওপর বসল। তখন আদ্য তার দাবীকে আসল ঘটনা বলে বলল। আদ্য বুঝতে পারল, তার দাবী খুব অবস্থিতে পড়ল। দাবীরবাড়ীতে তার নিজের অবস্থা তেমন ভাল না। তবে আদ্য যে তার বোঁ-এর কাছে এসে কথা বললেন সেজন্য সে আদ্যের বুদ্ধির খুব তারিফ করল। বোঁকা পেল, সেই প্রোটেক্টাণ্ট বাচ্চার বোঁকা তার অল্পবয়সী বোঁ তেমন ভালভাবে নেবে না। বানিয়ে বলা কথাই ঠিক রাখা ঠিক করল তার দাবী।

কিন্তু বেনীহিন আর তা করা সহজ নয়।

আদ্য মাঠে কাজ করত আর অল্প সকলে যখন বিশ্রাম করত তখন সে দুটে বাঁকী আসত 'তার' বাচ্চাকে দেখাওনা করতে। বাচ্চাটা বড় হয়ে উঠল, এমন কি মোটালোটাও হয়ে উঠল। আদ্যকে দেখলেই হাসত আর দাবী তুলতে চেষ্টা করত। কিন্তু তারপর শীত এল, বৌদিটি শুক করল আদ্যের দাবীর খবর নিতে।

আদ্যের দাবীরবাড়ীতে থাকতে কোনো আপত্তি ওঠেনি, তাকে ঘিরে অনেক কাজ হয়। কিন্তু অহুবিধা হল প্রতিবেশীদের নিয়ে। তারা আদ্যের বাচ্চার দাবী বাচ্চাটাকে একবার দেখতেও আসে না দেখে অবাক হতো। বাচ্চাটার একটা দাবী না দেখাতে পারলে দাবীরবাড়ীতে এই নিয়ে কথা উঠতে দেয়ী হবে না।

এক রবিবার সকালে সেই চাবী তার ঘোড়ার গাড়ী জুড়ল, তারপর আদ্যকে হাঁক দিল সঙ্গে দাবীর জন্য; পানের গ্রাম থেকে একটা বাছুর আনতে হবে। ঘোড়ার গাড়ী যখন খুঁখটিয়ে চলছে তখন সে জানাল থেকে আদ্যের জন্য একটা দাবীর খোঁজ করেছিল এবং একজনকে পেয়েও গেছে। লোকটা চাবের মজুর, একটা কুঁড়েঘরে থাকে, মরতে বসেছে। ওরা যখন সেই কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেই লোকটার বলতে গেলে তার মোকদ্দমা বিছানা থেকে দাবী তোলায় কন্যতাও নেই।

সে আদ্যকে ঘিরে করতে গাড়ী ছিল। তার দাবীর কাছে তার দাবী

ধাক্কিয়ে। বয়স হয়েছে—চামড়ার রঙও হলুদ হয়ে উঠেছে। সেই কাজের জন্য তার কিছু দাবি ছিল।

দশ মিনিটের মধ্যে পাওনা-পণ্ডা নিয়ে কথা-বার্তা চুকে গেল। আদ্রা আর তার দাদা বাড়ির কিনতে রওনা হল। সেই সন্ধ্যার শেষেই বিয়েটা হয়ে গেল। পাত্রী যখন বিড়বিড় করে বিয়ের রহ উচ্চারণ করছিল তখন সেই রোগী কিন্তু একবারও তার কাঁচের হাত চোখ আদ্রার দিকে কেনারনি। আদ্রার দাদার কোনো সন্দেহই ছিল না যে লোকটা দু-একদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাহলে আদ্রার স্বামী আর ওই বাচ্চার বাবা তাদের কাছে আসবার পথে আউপ্সবুর্গ-এর কাছে একটা গ্রামে মারা যাবে, তাহলে আর বিধবা আদ্রার তার দাদার বাড়ীতে থাকা নিয়ে কেউ অবাঁক হবে না।

এই অভূত দিয়ে শেষ হলে আদ্রা খুশি মনে ফিরে এল—এ বিয়েতে শীর্ষার ঘন্টা বাজেনি, ব্যাওও বাজেনি। ঘেরেরা উপস্থিত ছিল না, নিমন্ত্রিতও ছিল না কেউ। আদ্রার বিয়ের পর জুটল এক টুকরো কটির সঙ্গে একটু চবি তার দাদার খাবার ঘরে, তারপর দাদার সঙ্গে গেল ব্লুডিটার কাছে, যেখানে বাচ্চাটা শুয়ে, সে একটা নাম পেল। আদ্রা বিছানাটা ঠিক করে তার দাদার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওদিকে কিন্তু সেই লোকটির মরবার কোনো লক্ষণ নেই।

পরের সন্ধ্যায়ে নয়, তার পরের সন্ধ্যাহেও না—সেই বুড়ীর কাছ থেকে কোনো খবরই এল না। আদ্রা খামারবাড়ীতে সবাইকে বলে রেখেছে, তার স্বামী এখানে আসবার জন্য রওনা হয়ে গেছে। লোকে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, আসছে না কেন, তখন আদ্রা বলতে শুরু করেছে, এত বরফ পড়েছে তাই বুঝি তার আসতে দেরী হচ্ছে। তারপর যখন আরো তিন সন্ধ্যাহ কেটে গেল তখন তার দাদা সত্যি সত্যিই অস্থির হয়ে আউপ্সবুর্গ-এর পানের সেই গ্রামের পথে রওনা হল।

অনেক রাতে সে ফিরে এল। আদ্রা তখনো ভেগেই ছিল। খামার-বাড়ীতে গাড়ীর আগুয়ান্ড তিনেই সে জুটল বরফের দিকে। দেখল, তার দাদা কেমন ধীরে-সুস্থে বোড়টাকে গাড়ী থেকে আলোড়ন করছে। আদ্রার বুকের মধ্যে ভোলপাড় করতে শুরু করল।

দাদা খামার খবর নিয়ে এসেছে। সে সেই কুঁড়েঘরে ঢোকবার সময় ঐ

আবহরা বরটিকে খাবার টেবিলে বসতে পার। গারে শুধু একটা মাট আর দুখ ভটি খাবার চিবাঁজিল। লোকটা সম্পূর্ণ হুহ হয়ে উঠেছে।

আরো সব বলবার সময় চাষী আর আহার মুখের দিকে তাকাল না; সেই লোকটার নার ওয়ে পট্টারার, আর তার মাও এমন ঘটনার আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল বলে বনে হয়, তাই কি করা যায় তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। ওট্টারারকে বেধে তেমন খাড়াপ মনে হয়নি। সে সামান্য কথা বলেছে, তবে একবার যখন তার মা পক্ষপাত শুরু করতে বাঁজিল যে এখন তাদের বাড়ি এক উইকো বৌ আর কার না কার এক ছেলে এসে চেপে বসল, তখন সে তাকে চূপ করতে বলে। যতকণ কথা-বার্তা চলছিল, ততকণ সে আপন মনে তার চীক্ খেয়েছে। এই চাষী যখন চলে আসে তখনো সে বাঁজিল।

পরের কটা দিন আহার আত্মবিক ভাবেই খুব চুপ্চিস্থার মধ্যে কাটল। বাড়ীর কাজ-কর্মের কালে সে বাজাটাকে হাঁটতে শেখাতো। ও যখন দুহাত বাড়িয়ে টলমলে পারে এগিয়ে আসত তখন আরা শুকনো কারাটা গিলে কেলত, তারপর শুকে ভড়িয়ে ধরত বুকে চেপে। একবার সে তার হালাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : লোকটা কী রকম? আরা তাকে শুধু বৃত্তাশয়ার দেখেছিল, তাও লজ্জার পর—একটা কালো মোমবাতির আলোয়। এখন সে জানতে পারল, তার স্বামী বাটতে খাটতে শেব হয়ে যাওয়া বছর পঞ্চাশ বয়সী একজন, এসব চাবের বছরকের যেমন হয়ে থাকে, তেমনি আর কি।

কদিন পরেই আরা তার দেখা পেল। একজন ফেরিওয়ালা অনেক কায়দা করে গোপনে তাকে খবর দেয়, “এক বিশিষ্ট পরিচিত লোক” তার সঙ্গে অমুক দিনে অমুক সময়ে অমুক গ্রামের কাছে, যেখানে পারে চলার পথটা লাগুন-বার্গ-এর দিকে বাক নিয়েছে, সেখানে দেখা করতে চার। এমন করে দেখা হল বিবাহিত সম্পতির, তাদের দুজনের গ্রামের মাকামাকি কায়দার, যেম দুই সেনাপতি তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সীমার, বরকে ঢাকা খোলা মাঠে।

লোকটাকে আহার পছন্দ হল না।

তার দাঁতগুলো ছোট ছোট আর ছাই রঙের, আরা তাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখল, যদিও আহার গারে ভেড়ার চামড়ার মোটা পোশাক পরা ছিল, আর দেখবার যত তেমন কিছু ছিল না, তারপর “বিরের লপথ” কথাটা উচ্চারণ করল। আরা তাকে লক্ষ্যে বসল, তাকে সবটা আরেকবার ভেবে দেখতে হবে, আর সে যেম যে-কোনো ব্যাকসাই কিবা কসাই, যে গ্রোন-

আইটিডেন-এর ওপর দিবে যাবে তার মুখে আরার বৌকির কাছে থবর পাঠায়
যে সে শিশুটিরই আসছে, আর বলে যে পথে অস্থির হয়ে পড়েছে।

ওট্টারার তার স্বভাব মত বীরে মাথা নাড়ল। লোকটা আরার চেয়ে
লম্বার একমাথা বড় আর আল্লা যখন কথা বলছিল তখন সে শুধু আরার গলায়
বা বিকটা দেখছিল, তাতে আরার বেশ অবশ্যি হচ্ছিল।

থবর নিয়ে কিছু কেউ এল না, আল্লা তখন ভাবতে শুরু করল, বাচ্চাটাকে
নিরে সোজা আরো দক্ষিণ দিকে চলে যাবে, কেন্সটেন কিবা সমটোকেন-এ,
একটা কাতের খোঁজে। কিন্তু, মাঠের মধ্যকার ঐসব রাস্তার বিপদের কথা
লোকে বলে, তাছাড়া তখন মাত্র শীত, তাই সে সরে গেল।

এদিকে থামারবাড়ীতে থাকা কিছু কঠিন হয়ে উঠল। বৌদি ছুপুরে
থাওয়ার সময় সব মকুরদের সামনে তার স্বামী সবচেয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করে
প্রশ্ন করত। একবার যখন সে কপট করুণা দেখিয়ে বাচ্চাটাকে “বেচারী
পোকা” বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তখন আল্লা বাওয়াই ঠিক করে’ কলে, কিন্তু
তখন আবার বাচ্চাটার অস্থির করল।

বাচ্চাটা বিছানায় শুধু ছটফট করে, মুখটা টকটকে লাল, চোখছুটো
ঘোলাটে, আর আল্লা সারারাত তার জুড়ির পাশে বসে থাকে ডর আর আশা
নিরে। তারপর বাচ্চাটার অবস্থা ক্রমশ ভালর দিকে গেল, তার হাসি ফিরে
এল, তখন একদিন দুপুরের আগে হরকার টোকা পড়ল, তেতরে এল ওট্টারার।

সেই ঘরে আল্লা আর বাচ্চাটা ছাড়া তখন আর কেউ নেই। তাই আল্লার
আতঙ্ক চাপা দেবার হরকার হয়নি, আর তা হয়তো সম্ভবও হতো না। বেশ
অনেকটা সময় তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ওট্টারার বলল, সে
সবটা শুবে দেখেছে, আর এখন এসেছে আল্লাকে নিয়ে যেতে। সে আবার
বিরের শপথের কথা উল্লেখ করল।

আল্লার রাগ হল। চাপা গলায় হলেও স্পষ্ট ভাবে সে লোকটিকে জানিয়ে
দিল, তার সঙ্গে বাস করার কথা সে চিন্তাও করে না, সে কেবলমাত্র বাচ্চাটার
জন্য বিবেচনা করেছে এবং বাচ্চার একটা নাম ছাড়া লোকটির কাছে সে আর
কিছু চায় না।

আল্লা যখন বাচ্চাটার কথা বলছিল তখন ওট্টারার বাচ্চাটা যে জুড়ির
মধ্যে বলকল করছিল সেদিকে এক নজর তাকিয়েছিল, তবে সেদিকে
এগোয়নি। তাতে আল্লার রাগ তার ওপর আরো বেড়ে গেছিল।

লোকটা আরো দুটারটে পোছানো কথা বলল; আহার আর একবার সবটা ভেবে বেধা উচিত, তাদের বাড়ীতে হরিমটর রান্না হয় তাই তার যা রান্নাঘরে গুতে পারবে। এখন সময় চাষী বৌ এল, ষৌকুহলের সাথে ভালমন্দ কথা বলল তারপর তাকে হুপুরের খাওয়া খেতে অহুয়োদ করল। খাবার টেবিলে বসবার সময় চাষীর দিকে সাধারাটা ভাবে রাখা নাড়ল, যার অর্থ তাকে চেনে না হয় আবার চেনে তাও প্রকাশ পায় না। চাষী বৌ—এর সব প্রশ্নের জবাব এক কথায় দিল, তার চোখ দুটো কখনো খাবারের গ্রেট থেকে ভোলেনি। তার বক্তব্য, সে মেরিং-এ একটা কাজ পেয়েছে, আরা এখন তার কাছে গিয়ে থাকতে পারে। অবশ্য সেটা যে তত্বনি চতে হবে, এমন কথা আরাও বলল না।

বিকলে সে চাষীর সঙ্গে এড়িয়ে গেল, কেউ কিছু না বলা সত্ত্বেও বাড়ীর পেছনে গিয়ে কাঠ কাটতে শুরু করল। সন্ধ্যার খাবারে বসেও সে কারো সঙ্গে কথা বলল না। খাওয়ার শেষে চাষী-বৌ নিজে আহার করে একটা লেপ নিয়ে এল, রাতে শোবার সময় লাগবে, কিন্তু তখনই সে চোখে পড়বার মত ধীরে-দুধে উঠে দাঁড়াল, বিভ্রান্তি কবে বলল, তাকে সেই রাতেই নাকি কিরতে হবে। খাবার আগে বাচ্চা সমেত সুড়িটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা কিন্তু বলল না, একবার স্পর্শও করল না তাকে।

সেই রাতে আহার অহুদ করল, জর এল—এক সপ্তাহ অহুদ রইল। বেশীরভাগ সময়েই তার কিছু করবার উপায় ছিল না, শুয়ে থাকত। দু-চারবার হুপুরের দিকে জরটা একটু কমলে কোনো-ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে বাচ্চাটার সুড়ির কাছে গিয়ে তার বিছানাটা ঠিক করে দিত।

তার অহুদের চতুর্থ সপ্তাহে শুটারার খামারবাড়ীতে একটা গাড়ী নিয়ে হাজির, আয়াকে আর বাচ্চাটাকে নিয়ে রওনা হল। আরা সুখ বুজে সব ঘটতে ছিল।

আহার শক্তি দিয়ে পেতে অনেক সময় লাগল, চাষ-রজুরের বাড়ীর পাড়লা দ্বাপ খেয়ে তার বেশী আশা করা যায় না। কিন্তু একদিন সকালে কেবল বাচ্চাটাকে কি বোঝা ভাবে রাখা হয়েছে, সে তখন কণ্ঠা ঠিক করে উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চাটা নিষ্টি হলে বুদ্ধি আয়াকে অভ্যর্থনা জানাল। আহার হাঁদা বলত, ঐ ভালি নাকি বাচ্চাটা আহার কাছ থেকে পেয়েছে। বাচ্চাটা বড় হয়ে

উঠেছে, ঘরের চারদিকে আশ্চর্য দ্রুত গতিতে হাবা দিয়ে ঘুরছে, হাত ছুটোর খপাখপা করে শব্দ করছে যেহেতু ওপর আর হুমড়ি খেয়ে পড়লে একটুখানি করে কেঁবে উঠেছে। একটা কাঠের বালতিতে তাকে পরিষ্কার করে স্নান করিয়ে তারপর আত্মা তার শান্তি দিয়ে গেল।

সামান্য কদিন পর ঐ কুঁড়ে ঘরের জীবন আত্মা আর কিছুতেই শব্দ করতে পারল না। কয়েকটা কাঁধা দিয়ে বাচ্চাকে জড়াল, একটা কটি নিল আর সামান্য চীৎকার, তারপর পালাল।

ইচ্ছা ছিল সনটোফেন-এ যাবে, কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারল না। তার পায়ে তখনো জোর দিয়ে পারিনি, মার্চের রাস্তার বরফের কাঁধা, আর সব গ্রামের লোকেই বুকের দরুন বেশ সন্দেহ বাড়িকে জুগছে, কজল হয়ে উঠেছে। এই ভাবে পথ চলার তৃতীয় দিনে রাস্তার ধারের গর্তে পড়ে আত্মার পা মচকে গেল, বেশ কয়েক ঘণ্টা পর তাকে একটা ধারাবাড়ীতে নিয়ে আসা হল, এই সময়টা তার ছেলের কথা ভেবে আতঙ্কে কাটল। সেই ধারাবাড়ীতে তাকে গোরাল ঘরে গুয়ে থাকতে হল। বাচ্চাটা গরুগুলোর পায়ের কীকে কীকে হাবা দিয়ে ঘুরছিল আর আত্মা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলে শুধু হাসছিল। অবশেষে আত্মা সেই ধারাবাড়ীর লোকদের কাছে তার স্বামীর নাম বলতে বাধ্য হল, চাবী তখন তাকে আবার বেরিয়ে-এ ফিরিয়ে দিয়ে এল।

এর পর আত্মা আর পালাবার চেষ্টা করল না, অদৃষ্টকে মেনে নিল। প্রচণ্ড পরিশ্রম করত। সামান্য জরি থেকে কিছু বার করা বা ছোট্ট সেই সংসার চালাতো কঠিন। বাই হোক তার স্বামী তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। আর বাচ্চাটাও গুরুপেট খেতে পার। তার দাধাও হাকে মধ্যে আসে, আর সঙ্গে করে এটা সেটা উপহার আনে, একবার তো আত্মা বাচ্চাটার ছোট্ট কোটটা লাল রঙ করিয়ে নিতে পেরেছিল। তখন সে ভেবেছিল, রঙের কাজ করত বার বাবা তার ছেলেকে সেটা ভাল মানায়।

এই ভাবে দিন কাটতে থাকল, আত্মাও সন্তুষ্ট। বাচ্চাটাকে রাহুব করে তুলতে সে প্রচুর আনন্দ পায়। এমন করে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

কিন্তু একদিন আত্মা গ্রামে গেলি সিরাপ আনতে, কিরে এসে দেখল বাচ্চাটা ঘরে নেই, তখন তার স্বামী তাকে বলল, হুম্বর পোশাক পরা একজন মহিলা চমৎকার একটা বোড়ার গাড়ীতে করে এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে।

হত্যাশার আরা সেরালে থাকা খেল, আর সেই দিনই সন্ধ্যার একটা ছোট্ট পুঁটুলীতে খাবার নিয়ে আউস্‌স্বর্গ-এর পথে রওনা হল।

সেই শহরে পৌঁছে প্রথমেই গেল ট্যানারীতে। তাকে ভেতরে ঢুকতে কেত্তা হল না, আর বাচ্চাটাকে দেখতে গেল না।

বোন আর ভরীপতি বুঝাই তাকে সাহুনা দেবার চেষ্টা করল। সে রাজকর্মচারীদের কাছে গেল, কাণ্ডজান চারিয়ে চেষ্টাষেচি করল। তার বাচ্চাকে চুরি করে নিয়েছে। সে এমন কথাও বলল, বার অর্থ হয়, প্রোটেষ্টান্টেরা তার ছেলে চুরি করেছে। তখন সে জানতে পারল যে সবর পাণ্টে গেছে, ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে এখন শান্তি স্থাপিত হয়েছে।

তার ভাগা বিশেষ ভাল না হলে তার কিছুই হয়তো উপকার হতো না। তার বাবলার বিচারের তার পড়ল একজন বিচারকের ওপর, লোকটা অকুত প্রকৃতির।

বিচারকের নাম ইগনাস্‌ ডলিভার, সারা শোয়াবিত্রা এলাকা জুড়ে তার কর্তৃপ ব্যবহার আর শিক্ষা দেবার কথা সবাই জানত। ব্যাভেরিয়ার রাজার সঙ্গে তার একবার আইনের লড়াই হয়েছিল। সেই রাজা তার নাম দিয়ে “এই ল্যাটিনীর নোংরা চাবা”। নীচু সম্প্রদায়ের লোক তবে শেষ পর্যন্ত লোকে তার গুণগানই করেছে।

বোন ভরীপতি সঙ্গে নিয়ে আরা তার কাছে গেল। সেই বঁটে অসম্ভব মোটা বুড়ো লোকটা একটা ছোট্ট কঁাকা বয়ে সাধাগাধা পার্চমেন্ট কাগজের মধ্যে বসে আবার কথা খুব সাহান্য শুনল। তারপর একটা পাতায় কি একটা লিখে, ধমকে উঠল, “ওখানে গিয়ে গাড়াও, ভালদি কর।” তার ছোট মোটা হাত দিয়ে হেথিরে ছিল আরপাটা, সেখানে লক জানালা দিয়ে এককালি আলো এসে পড়েছে। কয়েক মিনিট ধরে আবার মুখটা দেখল, তারপর ঢেকুর তুলে চলে বাবার ইশারা করল।

পরদিন একজন কর্মচারীকে দিয়ে আরাাকে ডেকে পাঠাল, আরা হোর-পোড়ায় এসে গাড়াতেই তাকে ধমকে উঠল : ‘ট্যানারী আর তার সব সম্পত্তি চাও, সে ব্যাপারে আরাাকে একটা কথাও বলনি কেন?’

আরা বতবত খেয়ে বলল, সে শুধু বাচ্চাটাকে চায়।

“ভেব না যে তুমি ঐ ট্যানারীর বখল পাবে”, বিচারক চিন্তার করে উঠল,

“ঐ বেজমাটা যদি নড়ি নড়িই তোয়ার হয়, তবে ঐ টানারীর মালিক হবে
বসিঙলির কোনো আত্মীয়।”

আম্মা তার দিকে চোখ না তুলে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, “টানারী
দরকার নেই।”

“ছেলেটা তোয়ার?” ভক্তার দিয়ে উঠল বিচারক।

“হ্যাঁ”, আম্মা বলল আস্তে করে। “ও সব কথা নিখে উঠতে পারা পর্বত
যদি পেভায়। ও সব লাভটা কথা বলতে পারে।”

বিচারক একটু কাশল, তারপর তার টেবিলের পার্চমেন্টগুলো পোছ-পাছ
করল। এবার শান্ত ভাবে তবে বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলল :

“তুমি চাও এই ছানাটা, আর ওহিকে পাচটা মিষ্টির পেটিকোট পরা
চাপলটা তাকে চায়। ছেলেটার দরকার একটি আসল মা।”

“হ্যাঁ”, বলল আম্মা, তারপর তাকাল বিচারকের দিকে।

“ভাগো এখন”, ভক্তার দিয়ে উঠল বিচারক। “শনিবার বিচার করব।”

সেই শনিবার বড় রাস্তা আর প্যারল্যামেন্ট-এর ওপর সিটি হলের সামনের
জায়গা মাড়রের ভিড়ে কালো হয়ে উঠল, সবাই সেই প্রোটেক্ট-এর শিশুর
মামলা দেখতে চায়। এই অভূত মামলা শুক থেকেই প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি
করেছে। সব পরিবারে এবং হোটেল-রেস্তোরার অনেক তরু বিতর্ক হয়েছে,
কে প্রকৃত মা আর কেই না নকল। তাছাড়া সেই বড়ো ভলিডারও তার
বিখ্যাত গুনানি আর কটুকি ও সেই সঙ্গে হুবিচারের জন্য ওই এলাকা জুড়ে
খুব নাম করেছিল। তার মামলাগুলো মজার হলোড় বা হেলার চেয়ে বেশী
পছন্দ করত লোকে।

তাই সেই সিটি হলের সামনে শুধু আউগ্‌সবুর্গ-এর লোকট না, সেই
এলাকার চাষীও কম জড়ো হয়নি। শুক্রবার হাটবার গেছে, গুনানি শনিবার
আশায় তারা শহরেই রাত কাটিয়েছে।

বে বিশাল হলঘরে ভলিডার বিচার করত, সেটার নাম ছিল ‘বর্ণ-বন্ধ’।
সবস্ত জার্মানিতে শিলার ছাড়া এত বড় ঘর আর ছিল না, সেই জন্য সেটা
বিখ্যাত ছিল। সেই ঘরের সিলিং শেকল দিয়ে ছায়ে কাঠামো থেকে
ঝোলানো ছিল।

একটা লম্বা দেওয়ালের পায়ে বসানো রোজের কপাট বন্ধ করা দরজার
সামনে ভলিডার বলে, একটা ছোটখাট গোল বাসের পাহাড়। একটা সাধারণ

হুজি নিয়ে মোতাসের জারণা আলাকা করে দেয়া হয়েছে। বিচারক কিন্তু যেহেতু ওপর বলা, তার সাহসে কোনো টেবিলও ছিল না। বেশ কয়েক বছর হল নিজে এই ব্যবস্থা করেছে। সাক্ষ্যমাটা ব্যাপারই তার পছন্দ।

হুজির সীমানার ভেতরে ফ্রাউ এলিডলি তার বাবা-মায়ের সাথে, বৃত্ত হেয়ার এলিডলির আত্মীয়রা এসেছে হুটকারল্যাও থেকে—কুজন ভাল পোশাক পরা অভিজাত লোক, বেখে মনে হত অবতারণা ব্যবসায়ী, আর আরা ওট্টারার তার বোনের সাথে। ফ্রাউ এলিডলির পাশে আয়ার কোলে বাচ্চাটাকে দেখা যাচ্ছে।

সবাই, বাবী-বিবাহী এবং সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে। বিচারক ডলিডার বলে, সাক্ষী-সাবুদের দাঁড়িয়ে থাকতে হলে মামলার নিশ্চিতি তাড়াতাড়ি হয়। এমনও হতে পারে, ওদের দাঁড় করিয়ে রাখত নিজেকে লোকের চোখের আড়ালে রাখবার জন্য, তাকে দেখতে চলে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে বাড় লম্বা করে দাঁড়াতে হতো।

শুনানির শুরুতেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। আয়াকে দেখতে পেরেই বাচ্চাটা চিংকার করে উঠল আর এগিয়ে এল, ও আয়ার কাছে যেতে চায়। আয়ার কোলের মধ্যে ধস্তাধতি করতে শুরু করল, আর সেই সঙ্গে কাঁদা। বিচারক বাচ্চাটাকে ঘরের বাটরে নিয়ে যেতে বলল।

এবার ফ্রাউ এলিডলিকে ডাক ছিল।

সে ছুটে সাহসে এল, একটা কয়াল নিয়ে হাকে মধ্যে চোখের সাহসে জুলিয়ে বলল, কাইকারের সৈন্যদের লুঠ-তরাতের সময় সে কেমন করে বাচ্চাটার কাছ থেকে আলাকা হয়ে পড়ে। সেই রাতেই ত্রি-টা তার বাবাব বাড়িতে আসে আর খবর দেয় যে বাচ্চাটা তখনো ঐ বাড়ীতে আছে, বোধহয় বকলিশ-এর আশায়। তার বাবার বাড়ীর একজন রংগুনীকে সেই ট্যানারীতে পাঠানো হয়, কিন্তু সে বাচ্চাটাকে আর দেখতে পায়নি। তার ধারণা, ও (আয়াকে দেখাল) তাকে নিয়ে গেছে, কোনো জবরহুতি কবে কিছু অর্থ আদায় করবার আশায়। সময় হত বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে না আনলে, ও ট্রিকট কোমোহিন ওরকম হাবি নিয়ে হাজির হত।

বিচারক এবার হেয়ার এলিডলির আত্মীয় কুজনকে সাহসে আসতে বলে জানকে চাইল, সেই সময়ে তারা হেয়ার এলিডলির খোঁজ করছিল কিনা এবং ফ্রাউ এলিডলি তাদের কি বলেছিল।

তার বলল, ক্রাউৎসিঙলি তাদের জানিয়েছিল, তার খাবার মাঝি খুব হয়েছে আর বাচ্চাটাকে একটা স্নিগ্ধের জিন্দগারীতে রাখা হয়েছে, সেখানে সে নিরাপদে আছে। তারা ক্রাউৎসিঙলির প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটা ভাব প্রকাশ করেছিল, তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না, কারণ ক্রাউৎসিঙলি মায়লার ছেলে খেলে সম্পত্তিটা তাদের হাথলে আসবে।

এদের কথা শেব হল বিচারক আবার ক্রাউৎসিঙলিকে ডাকল, তারপর তার কাছে জানতে চাইল, সেই আক্রমণের সময় সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বাচ্চাটাকে অসহায় অবস্থায় কেলে চলে গেছিল কিনা।

ক্রাউৎসিঙলি বেন অবাক হয়েছে এমন ভাবে ক্যাকাসে নীল চোখে বিচারকের দিকে তাকাল, তারপর আরও ঘরে বলল, সে তার বাচ্চাকে অসহায় অবস্থায় কেলে রেখে যায়নি।

বিচারক ভলিডার গলা ঝেড়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, সে একথা বিশ্বাস করে কিনা, যে কোনো মা তার বাচ্চাকে অসহায় অবস্থায় কেলেতে পারে না।

হ্যাঁ, সে কথা সে বিশ্বাস করে, জোর দিয়ে বলল ক্রাউৎসিঙলি।

তাহলে সে বিশ্বাস করে কিনা, বিচারক আরো জানতে চাইল, যে মা এমন কাজ করে, তার পাছায় বেশ করেক বা বলিয়ে দেওয়া উচিত, তা সে তার পরনে বসে খুশি পেটিকোটাই থাকুক না কেন ?

ক্রাউৎসিঙলি কোনো উত্তর দিল না। বিচারক তখন সেই কালের বি আন্সাকে ডাক দিল। আন্সা তাড়াতাড়ি সামনে এসে দাঁড়িয়ে বৃহৎ গলার গুনানির আগে বা বলোছিল, তাই বলল। সে কথা বলছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল বেন সে সেই সঙ্গে কান পেতে কি শুনেছে। বারে বারেই বিশাল দরজাটার দিকে তাকাচ্ছিল, ওই দরজা দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ভয় হচ্ছিল, বাচ্চাটা বুঝি এখনও কাঁদছে।

আন্সা বলল, সে অবশ্য সেই রাতে ক্রাউৎসিঙলির কাকার বাড়ীতে গেছিল। তবে তারপর আন্স সেই ট্যানারীতে ফিরে যায়নি। কাইজারের সৈন্যদের ভয়ে, তাছাড়া তার নিজের কুয়ারী অবস্থার বাচ্চার জন্তও তার হুশিয়ার ছিল। সেই বাচ্চাকে পাশের গ্রাম লেখহাউসেন-এ ভাল লোকেরের জিম্মায় রাখা হয়েছিল।

বৃহৎ ভলিডার তাকে ধমক দিয়ে বাধা দিয়ে বলল, তাহলে সে সময়ে এই

পহরে অস্তুত একজন লোক ছিল, যার মধ্যে তর জাতীর একটা অস্বভূতি দেখা দিয়েছিল। সেটা সঠিকভাবে জানতে পেয়ে সে খুশি, কারণ তার থেকেই প্রমাণ হয়, অস্তুত একজনের মধ্যে বাহুবীর বাতাবিক প্রবৃত্তি তখন ছিল। সাকী যে শু নিজেই হেলের জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এটা অবশ্যই ভাল কথা নয়, তবে একটা কথা আছে—রক্তের টান। তাছাড়া, প্রকৃত বা সত্যানের জন্ত চুরিও করতে পারে। সেটা অবশ্যই আইনত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কারণ অপরের জিনিস অপরেরই জিনিস। আর যে চুরি করে সে মিথ্যা কথাও বলে এবং মিথ্যাচারও আইনের চোখে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারপর আদালতকে বোঁকা দেয় যেসব লোকেরা তাদের স্বাধীনতার ওপর তার আর সব বক্তৃতার মধ্যে একটা বিচক্ষণ এবং স্পষ্ট বক্তৃতা ছিল, কলে তাদের যুগ কাল হয়ে উঠল; এরপর নির্দোষ গল্পগুলোর চুখে জল বেশার যেসব গল্পলা আর পহরের কঠোরানীর অফিসার, যে চাবীদেয় কাছ থেকে অত্যধিক কর আদায় করে, তাদের সঙ্গে এই রায়লার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই নিয়ে একটুখানি ভাবনা করে জানাল, সাকী নেওয়া শেষ এবং তার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত আসা গেল না।

তারপর অনেকক্ষণ চূপচাপ বলে থাকল, আর তার নিঃশব্দ ভাবের সময় লক্ষ্য প্রকাশ করল। চারদিকে তাকাতে থাকল যেন কেমন করে একটা নিশ্চিন্তি করা যায় সেই ব্যাপারে যে কোনো তরফ থেকে একটা বুদ্ধি আনা করছে।

সবাই বোঁকা বনে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ কেউ গলা লম্বা করে অলম্বার বিচারককে এক নজর দেখার চেষ্টা করছে, সে লোকটি কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঘরের মধ্যে বসে। শুধু হাতা অবধি জড়ো হওয়া বাহুবীর গুণন শোনা যাচ্ছে।

তারপর নিখাল কলে বিচারক আবার যুগ খুলল।

“কে প্রকৃত বা, সেটার নিশ্চিন্তি হল না”, বলল। “বাচ্চাটার জন্য হয়। একথা প্রায়ই শোনা গেছে, বাধারা প্রায়ই কেটে পড়ে, বাবা হতে চায় না, তারা সব বেহারা, কিন্তু এখানে একসাথে ছোটো বা হাজির। আদালত এতক্ষণ তাদের বক্তব্য শুনল, প্রত্যেকেই স্ববোধ পেয়েছে, নির্য-যাতিক পুরো পাঁচ মিনিট ধরে বলবার, এবং আদালত নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেয়েছে, হুমকীই তাহা মিথ্যা বলছে। কিন্তু এদিকে, আমরা সবাই জানি,

বাচ্চাটার কথাও ভাবতে হবে, ওর একটা মায়ের দরকার। হুতরাং কেবলমাত্র কাঁকা বুলি না আউড়ে স্থির করতে হবে, কে প্রকৃত মা।”

তারপর বিরক্তভাবে আদালতের কর্মচারীকে হুকুম করল, একটা চক আনতে।

কর্মচারীটি গিয়ে এক চুকরো চক নিয়ে এল।

“চকটা দিবে এখানে যেখানে একটা গোল করে হাগ টান। এমন ভাবে টানবে যেন তার মধ্যে তিনজন পাড়াতে পারে।” বিচারক বুঝিয়ে দিল।

কর্মচারীটি হাটু গেড়ে বসে ঘেঁষের ওপর ফরমাশ মত একটা বৃত্ত আঁকল।

“এবার বাচ্চাটাকে নিয়ে এস”, বিচারক হুকুম করল।

বাচ্চাটাকে নিয়ে আসা হল। সে আবার চিৎকার জুড়ে দিল, আমার কাছে যেতে চায়। বুড়ো ডলিডার সেই চট্টগোলের দিকে কর্ণপাত না করে তার বক্তব্য বলতে শুরু করল, শুধু গলার স্বর এবার একটু তুলে।

“বে পবীকা এখন করা হবে”, বলল, “সেটা আমি একটা প্রাচীন বই-এ পেয়েছি, এবং এটা একত্রে ভাল চলবে। খড়ির চক্রের এই পরীক্ষার সহজ মূল কথা হচ্ছে যে এর সাহায্যে প্রকৃত মায়ের সন্ধান নেও প্রকাশ পায়। অর্থাৎ এই ভালবাসার পভীরতা যাচাই করা হবে। আরদালী, বাচ্চাটাকে ওই খড়ির চক্রের মাঝখানে রাখ।” আরদালী আমার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে এল। সে এখনো চিৎকার করে চলেছে। তাকে সেই বৃত্তের মধ্যে নিয়ে গেল। বিচারক ফ্রাউৎসিডলি আর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমরাও যাও এই বৃত্তের মধ্যে। প্রত্যেকে বাচ্চাটার একটা চাত ধরবে। তারপর আমি যখন বলব ‘শুরু’, চেষ্টা করবে বাচ্চাটাকে বৃত্তের বাইরে বার কবে নিতে। তোমাদের মধ্যে যে বেশী ভালবাসে, সে টানবেও বেশী জোরে আর ওমনি করে বাচ্চাটাকে নিজের দিকে টেনে নিতে পারবে।”

চল ঘরটার মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। দর্শকরা পারের আঙুলের ভগ্নায় পাড়িয়ে তাদের সামনের লোকেরদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল।

কিন্তু ঘেরেরা সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকে বাচ্চাটার চট্টো চাত ধরে পাড়াতেই সবাই চুপ করে গেল। বাচ্চাটাও বোবা হয়ে গেছে, শুধু বুকতে পেরেছে, গুকে নিয়েই এত কাও। মুখটা চোখের জলে ভেঙ্গে গেছে, আমার দিকে প্রায় বুকে তাকিয়ে আছে। এইবার বিচারক হুকুম করল, “শুরু”। আর একটি মাত্র কটকা টানে ফ্রাউৎসিডলি বাচ্চাটাকে সেই খড়ির বৃত্তের বাইরে

বিস্তে গেল। হতভব এক অবস্থানের চোখে আশ্রিতার দিকে তাকিয়ে
রইল। ওর ছোট ছোট হুঁহাত ধরে একসঙ্গে ছুঁকি থেকে টানলে বাচ্চাটার
কতি হতে পারে ভেবে সে সাথে সাথে হাত ছেড়ে দিয়েছে।

বুড়ো ভলিভার উঠে দাঁড়াল।

“তাহলে বোকা গেল”, ছোর গলায় বলল, “প্রকৃত না কে। ওই
হতভাগীর কাছ থেকে সরিয়ে নাও। ও বাচ্চাটাকে অন্যায়লে টুকরো
টুকরো করে কাটতে পারে।” তারপর আশ্রিতার দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু
বেড়ে ত্যাগাত্যাগি হলধর ছেড়ে চলে গেল তার সকালের খাবার খেতে।

আর তার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে সেই ভলিভার চাবীরা নিজেকেই মধ্যে
বলাবলি করেছে, তারা মোটেও অবাক হয়নি, সেই বিচারক যখন মেরিড-এর
মহিলাকে বাচ্চাটা দিতে বলে তখন নাকি চোখ টিপে ইশারা করেছিল।



সেই দুই ছেলে

১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে, যখন হিটলারের যুদ্ধ শেষ হয়েছে তখন ডারিঙেন এলাকার এক চাবী-বোঁ দল দেখে, তার ছেলে মাঠ থেকে ডাকছে। যুব চোখে বাড়ীর উঠানে বাবার সময় তার মনে হল, তার ছেলে ভলের কলেব কাছে—জল খাচ্ছে। তাকে ডেকে কথা বলতে গিয়ে বুকেতে পাবল, যেসব যুবক রাশিয়ান যুদ্ধবন্দী তার খামার বাড়ীতে কাজ করতে বাধ্য ছিল, এটি তাদের মধ্যে একজন। তার কয়েকদিন পয সেই চাবী-বোঁ এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করল। কাছেই একটা জল ছিল, সেখানে যুদ্ধবন্দীরা পাচের ঝুড়ি উপড়ে তোলাব কাজ করছিল; চাবী-বোঁ তাদের খাবার পৌছে দিতে গেছিল। ফিরে আসবার সময় মূখ ঘুরিয়ে সেট একট যুবক যুদ্ধবন্দীকে দেখে—বলা হয়নি, যুবকটি অসুস্থ—টিনের পাজটার দিকে তাকাতে, ওটা কে যেন তার দিকে এগিয়ে ধরে ছিল। যুবকটির মধ্যে চতুশা স্পষ্ট, আর হঠাৎ সেট মূখটা তার নিজের ছেলের মূখ হয়ে গেল। এই যুবকটির মূখের হঠাৎ পাণ্টে তার নিজের ছেলের মূখ হয়ে বাবার ঘটনা তার পরের দিনগুলোতে প্রায়ট ঘটে যেন যেন। তারপর সেট যুদ্ধবন্দী অসুস্থ হয়ে পড়ে; শুক্রবাহীন অবস্থায় সে গোলাবাড়ীতে পড়ে থাকে। তাকে স্থপায়া দেবার ইচ্ছা চাবী-বোঁ নিজের মধ্যে প্রবল হচ্ছে, টের পেল। তবে সে ব্যাপারে তার ভাই বাধ সাধল, সে যুদ্ধে পজু হয়ে ফিরে এসেছে, সেট খামার বাড়ীর তদারক করে, আর যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কড় ব্যবহার করে, বিশেষ করে সেট সময়টাতে, যখন সবই ওলট-পালট হয়ে যেতে শুরু করেছে আর গাঁয়ের সবাই যুদ্ধ-বন্দীদের ভয় পেতে শুরু করেছে। চাবী-বোঁ নিজে তার ভাই-এর মুক্তি উপেক্ষা করতে পারেনি; এইসব বন্দীদের সম্বন্ধে সে এত ভয়কর সব কথা শুনেছে যে তাদের সাহায্য করা তার কাছে কোনরতেই উচিত মনে হয়নি। সে ভয়ে ভয়ে ছিল, তার ছেলে পূর্ব দিকে আছে, তার কি হাল এই শকরা করতে পারে ভেবেই ভয়। ভাই এই বন্দীর অসহায় অবস্থায় তাকে সাহায্য

করবার সাহায্য উদ্দেশ্যেও তখনো পালন করেনি, তখন একদিন সন্ধ্যায় বরফে ঢাকা কলের বাগানে একমল বন্দীকে চুপে দেখে ফেলে, তারা ব্যস্তভাবে নিজেকে মনে কি যেন কথাবার্তা বলছিল, যাতে ব্যাপারটা কেউ জানতে না পারে সেইকম বোকাবড় তারা ঐ ঠাঁওয়ার মধ্যে তাদের আলোচনা সারছিল। সেই মুহূর্তটি সেখানে তাদের মধ্যে ছিল, জয়ে কাঁপছিল, আর খুব সম্ভব তার বিশেষ দুর্বল অবস্থার দৃশ্যটি চাষী-বৌকে তাদের সামনে দেখে সবচেয়ে বেশী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সেই আতঙ্কের মধ্যে এবার আবার তার মুখের সেই অদ্ভুত পরিবর্তন হল, চাষী-বৌ যেন তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত আতঙ্কিত করার মত। এট ঘটনা তার চেতনের পটীর ভাবে কাজ করে চলে। তাই যদিও কর্তব্য রক্ষার প্রয়োজনে সে তার ভাইকে কলের বাগানে সেই আলোচনায় কণা বলে, তবুও সে ঠিক করে ফেলে, সেই মুহূর্তটিকে এখন থেকে স্মরণে আনাটা করে যেটা করে কাটা চান্নার টুকরো ঠিকে দেবার কথা। পাঁচ রাইখের আর্মির কিছু লোকদের মত এটিও একটা সাংঘাতিক কঠিন আর বিপজ্জন কাজের মধ্যে পড়ত। একাকী করবার সময়ে তার নিজের দাঁড়িও পুরুত্বের বলে পড়ত, আবার দুজনকোঁরের ব্যাপারেও স্মরণ নিকিত চলে পাইছিল না। এসব সম্বন্ধে কাজটা করে যাচ্ছিল। তবে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া সময় সে জানতে পেরে গেছিল, বন্দীরা সত্যি সত্যিই পালিয়ে যাবার মতলবে ছিল। তাদের বিশেষ দিনে দিনে বেডেই চলেছিল, ক্রমশ কিছু চটে আসা রেড আর্মির লোকেরা তাদের পশ্চিম দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে কিংবা প্রেক্ষণ শেষ করে ফেলবে। চাষী-বৌ সেই মুহূর্ত বন্দীর ভাড়া খাড়া কর্মণ ভাবায় প্রকাশ করা ইচ্ছা তার বিশেষ চাত-পা-নাড়ার সাহায্যে ত্যাগ করতে পারল না, সেই অদ্ভুত ঘটনার কলে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, অগত্যা তাদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলল। একটা কোট আর একটা বড় মোটা কাটবার কাঁচি মত যোগাড় করল। অবাক কাণ্ড, সেই থেকে সেই মুহূর্ত পাল্টে যাবার ঘটনা আর ঘটনি; চাষী-বৌ তখন শুধু একজন বিশেষ মুহূর্তকে সাহায্য করে চলেছে। তাই যখন কেন্দ্রসারী হালের পেরের এক সকালে তার জানলার টোকা দেবার পক্ষ হল আর সেই জানলার কাঁচে ভোরের আলোর তার ছেলের মুখটা দেখতে পেল, তখন সে বেশ আশ্বস্ত পেল। এবার এটা তার ছেলের মুখ। তার পরনে এস-এস-

বলের হেঁকা ইউনিকরন, তার বলের সবাই শেষ হয়ে গেছে আর সে উদ্বেজিত
 ভাবে খবর দিল, রাশিয়ানরা সেই গ্রাম থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার
 দূরে রয়েছে। তার এই বাড়ী তেরার খবর যেন অতি অবশ্য গোপন রাখা
 হয়। ছাঘের ঘরের এক কোণে কোর্টমার্শাল গোছের এক বৈঠক বসল,
 সেখানে চাবী-বৌ, তার ভাই আর তার ছেলে পরামর্শ করে ঠিক করল,
 সবাই আগে বুদ্ধবন্দীদের শেষ করতে হবে, কারণ তারা হয়তো এই এস-এল
 সৈনিককে বেধে ফেলেছে আর ডাছাড়া তাদের সঙ্গে বে ব্যবহার করা হয়েছে
 তাও বলে দেবার সম্ভাবনা আছে। কাছেই একটা পাথরের খাত আছে।
 এস-এল-এর লোকটি আর কারো কথা শুনতে রাজী নয়, সে সাবাস্ত করল,
 সেই রাজ্যে একজন একজন করে বুদ্ধবন্দীকে গোলাবাড়ীর বাইরে তুলিয়ে এনে
 শেষ করতে হবে। তারপর বৃত্তদেহগুলি সেই পাথরের খাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে
 দিলেই হবে। সন্ধ্যাবেলায় বন্দীদের বেশ খানিকটা করে ত্র্যাণ্ডি খাওয়াতে
 হবে, তাতে তাদের সন্ধ্যা চবার কোনো কারণ নেই, ভাই-এর ধারণা,
 ইদানিং খামারের মজুররা আগে থেকে সাবধান হয়ে বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশার
 রাশিয়ানদের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা পাকা কবে রাখবে, যাতে সময়মত কাজে
 লাগানো যায়। এস-এল-এর লোকটি তার পরিকল্পনার কথা বলতে
 বলতে হঠাৎ দেখল তার মা কাঁপছে। ওরা তখনে ঠিক করে ফেলল, ওট
 মাকে কোনো ক্রমেই আর গোলাবাড়ীর কাছাকাছি যেতে দেয়া হবে না।
 তাই চাবী-বৌ আতঙ্কিত ভাবে রাতের অপেক্ষায় রইল। মনে হল রাশিয়ানরা
 খুশী মনেই ত্র্যাণ্ডি খেল, চাবী-বৌ তাদের মাতাল হয়ে একসঙ্গে ককণ গান
 গাইতে শুনল। কিছু যখন তার ছেলে এগারোটা নাগা গোলাবাড়ীতে
 গেল, তখন বন্দীরা সবাই পালিয়ে গেছে। ওরা মাতলাবির ভান করছিল।
 খামার বাড়ীতে এট নতুন অপ্রত্যাশিত দরদে তারা বুঝতে পেরে গেছিল,
 রাশিয়ান সৈন্যরা নিশ্চয় খুব কাছাকাছি এসে গেছে। রাশিয়ানরা অর্ধেক
 রাত পার হলে এসে পৌছোয়। ছেলে মাতাল অবস্থার ছাঘের ঘরে
 পড়ে, চাবী-বৌ ওহিকে ভয়ে এস-এল-ইউনিকর্মটা পুড়িয়ে ফেলতে ব্যস্ত।
 তার ভাইও মাতাল। তাই চাবী-বৌকেই রাশিয়ান সৈন্যদের আপ্যায়ন
 আর তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে হল। সে কাজ করে গেল
 পাথরের বৃত্ত নিরেট যুখে। রাশিয়ানরা সকালে চলে গেল, রোড আমি
 এগিয়ে চলল। ছেলে, তখনো নেশার বোর কাটেনি, আরো ত্র্যাণ্ডি চাইল

আর আনাল, সে ঠিক করে কেলেছে, জর্জন সৈন্যরা বেখানে পিছু হটছে, তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যুদ্ধ চালিয়ে বাওয়ার অর্থ এখন যে অবসরভাবী পতন, সে কথা বোকাবার চেষ্টা চাষী-বৌ করল না। কি করবে বুঝতে না পেরে সে পথ আটকে দাঁড়াল, চেষ্টা করল গায়ের কোরে আটকে রাখতে। ছেলে তাকে ধাক্কা দিয়ে খড়ের গাছার কেল ছিল। উঠে দাড়াবার সময় চাষী-বৌ হাতের কাছে কাঠের একটা ডাণ্ডা পেল, সেটা দিয়ে সে সেই উদ্ভাবকে আঘাত করল।

সেইদিন সকালেই এক চাষী-বৌ একটা গাড়ী নিয়ে পাশের হাটের তারপার রাশিয়ান কন্যাগার-এর কাছে গিয়ে হাজির হল, তার হাতে বলদের হাড়ি দিয়ে বীধা তার ছেলেকে সে যুদ্ধবন্দী বলে তুলে ছিল আর ছেলেটা যাতে বেঁচে থাকতে পারে সেই অনুরোধ বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল একজন বোকাবীর কাছে।



এক্সপেরিমেন্ট

অতান ব্রান্সিস বেকন-এর সাধারণ জীবনটা অশ্রমজনক সত্তা চলতি কণায় শেষ হয়েছিল : “অপকর্মের ফল শুভ হয় না।” দেশের প্রধান দিচাবলতি থাকা কালে তাঁকে খুব নেওয়ার দ্বারা অভিযুক্ত করা হয় এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর লর্ড থাকাকালীন সময়টা ব্যবসায়িক হও বিধান, কৃতিকারক মনোশিল্পের মজুরি, বেআইনী প্রেরারের আদেশ এবং প্রতাপিত রায় দান উৎসাহের উত্তিহাসের সবচেয়ে কৃৎসিত এবং কলঙ্কময় অধ্যায়। তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর এবং তাঁর স্বীকারোক্তির পর তিনি মানবতাবাদী এবং দার্শনিক হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অস্বাধগ সাম্রাজ্যের বাইরে বহুদূর অবধি জানাজানি হয়।

তাঁকে কয়েক থেকে মুক্তি দেবার পর যখন তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে এলেন তখন তাঁর বয়স হয়েচে। অপরের ক্রটি করবার জন্য পরিশ্রমের ফলে এবং অন্যেরা তাঁর ক্রটি করবার জন্য যা করেছিল তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য খেতে পড়েছিল। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে গভীর অধ্যয়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মাহুকের ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা বিফল হয়েছিল। তাঁর অবশিষ্ট শক্তি উৎসর্গ করলেন, মাহুত্ব কিভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে সবচেয়ে ভাল ভাবে নিয়োগ করতে পারে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। তাঁর গবেষণার কাজ প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য উৎসর্গ করার ফলে প্রায়ই তাঁকে পড়বার ঘর ছেড়ে মাঠে-ঘাটে, বাগানে আর আত্মাবলে যেতে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি মালীদের সঙ্গে কথা বলতেন, ফলের গাছগুলির উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে, কিংবা গরলা মেয়েদের নির্দেশ দিতেন, প্রতিটি গরুর দুধ কিভাবে দাশা সম্ভব। এসব করতে গিয়ে আত্মাবলের একটা ছোকরা তাঁর নজরে পড়ে। একটা খুব ভাল ঘোড়া অহুত্ব হয়ে পড়েছিল, সেই ছোকরা দিনে দুবার করে দার্শনিকের কাছে তার বিবৃতি দিত। ছেলেটির উৎসাহ এবং নজর করার ক্ষমতা বুদ্ধকে আকৃষ্ট করে।

বাই হোক একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন তিনি আত্মাবেশে গেছেন, বেবেন এক বুচ্চা চেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে। বুচ্চা বলছিল : “লোকটা খারাপ, সাবধানে থাকিস। মস্ত মাতুব চতে পারে, বিশাল বড়লোক হতে পারে, তবু লোকটা তো খারাপ। তোর পেট চালাতে হবে, কাজেই কাজকর্ম ঠিকমত করবি, তবে মনে রাখবি, লোকটা খারাপ।”

দার্শনিক ছোকরাটির উত্তর আর শোনে ন, কারণ তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেছিলেন, তবে পরদিন সকালে চেলেটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন না।

ষোড়শটা আবার শুধু হয়ে উঠলে তিনি ছোকরাটিকে তাঁর সঙ্গে এদিকে ওদিকে বেতে দিতেন আর তাকে ছোটখাট কাজের ভার দিতেন। আশ্বে আশ্বে তার সঙ্গে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে কথা বলবার অভ্যাস হয়ে গেল তাঁর। সেইসব কথা বলবার সময় কিছু কোনোক্রমেই এমন শব্দ ব্যবহার করতেন না, যেমন পরিণত বয়সের লোকেরা শিশুদের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে থাকে সাধারণত। কথা বলতেন, যেন একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে বলছেন। তাঁর সারাজীবন কেটেছে মস্তমস্ত সব পণ্ডিতের সঙ্গে আর তাঁকে তারা কড়াচিৎ বুকতে পেরেছে। তার কারণ এমন নয় যে তাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট ছিল, বরং তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। কাজেই চেলেটির অসুবিধার কথা চিন্তা করতেন না, তবে বিদ্রোহী শব্দ ব্যবহার করে ফেললে সেটা সংশোধন করে দিতেন যৈবোর সঙ্গে। চেলেটির প্রধান কাজ ছিল, সে যেসব জিনিস বেগছে এবং যেসব কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকছে, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দেওয়া। দার্শনিক তাকে চেবিয়ে দিতেন, কত শব্দ আছে আর কত শব্দ প্রয়োজন যার সাহায্যে কোনো বস্তুর বিবরণ দেওয়া সম্ভব হাতে সেটা অর্ধেক বোঝা যায় এবং বিশেষ করে সেটা বিবরণের সাহায্যে কর্তব্য স্থির করা যায়। এমন কিছু শব্দও আছে যা ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ সেসব শব্দ প্রকৃতপক্ষে কিছুই বলে না। ‘ভাল’, ‘মন্দ’, ‘হুম্মর’, এইসব শব্দ। চেলেটি খুব শিপশীপ বুকতে পারল একটা পোকাকে ‘হুম্মিত’ বলার ভেতর কোনো মানে হয় না। এমন কি ‘ক্রত’ শব্দটাও বখোঁট নয়। বলা হয়কার, একই আকৃতির আর সব পক্ষীর ডুঙ্গনায় সেটা কত ক্রত চলে এবং কিভাবে তা সম্ভব হয়। সেটিকে একটা খাড়া ডালের ওপর এবং একটা মন্দ

ভুলের ওপর রাখতে হবে আর এমন শব্দ করতে হবে যাতে ওটা হোঁফে পালায়, কিংবা ওটার জন্য সাহায্য খাড়া রাখতে হবে যাতে ওটা এগিয়ে যেতে পারে। যথেষ্ট সময় ওটার জন্য দিলে ওটা 'জড়' তার কর্বতা হারিয়ে ফেলে।

একবার ছেলেটির হাতে একটা কুটি ছিল, এমন সময়ে দার্শনিক এলেন তার সামনে, তখন তাকে কুটিটার বিবরণ দিতে হয়েছিল।

“একত্রে তুমি অন্যায়ালে ‘ভাল’ শব্দটা ব্যবহার করতে পার”, বৃদ্ধ বললেন, “কারণ কুটি হাতুঘের খাড়া হিসাবে তৈরী করা হয়েছে এবং হাতুঘের কাছে সেটা ভাল বা মন্দ হতে পারে। একমাত্র বড় বড় বস্তুর বেলায়, যেসব বস্তু প্রকৃতির সৃষ্টি এবং যেসব বস্তু কোনোক্রমেই বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্ট নয় এবং বিশেষ করে যেসব বস্তু কেবলমাত্র হাতুঘের ব্যবহারের জন্য নয়, সেইসব বস্তুই বেলায় ওসব শব্দ ব্যবহার করা যোকামি।”

বিল্ড লম্বা বলা তার ঠাকুমার কথাগুলি ছেলেটির মনে পড়ল।

যেহেতু সবকিছু সবসময়ে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় এমন চণ্ডার দৃষ্ণ ছেলেটির কল্পনাশক্তির ক্ষুদ্র উন্নতি হতে থাকল, যেমন একটা ঘোড়া কোনো জিনিস ব্যবহার করার ফলে স্তম্ভ হয়ে ওঠে কিংবা একটা গাছ তেমন কোনো জিনিস ব্যবহার করলে মরে যায়। সে আরো বুঝল যে সব সময়ে একটা যুক্তিসম্মত যিবা থেকেই যায়। হয়তো লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনগুলির জন্য দায়ী প্রকৃতপক্ষে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলোই। জানী বেকম-এর চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক অর্থ ছেলেটি বলতে গেলে কিছুই বুঝত না। কিন্তু সেই সমস্ত কাজের স্থলটি উপযোগিতা তাকে খুবই উৎসাহিত করত।

সেই দার্শনিকের ব্যাপারে সে বুঝেছিল : পৃথিবীতে একটা নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। বলতে গেলে হাতুঘ তার জ্ঞান প্রত্যেকদিন বাড়ছে। আর ব্যবহার জ্ঞানের অর্থ পাখির হাঙ্গামা এবং তৃপ্তির বৃদ্ধি। বিজ্ঞান পথ দেখাচ্ছে। বিজ্ঞান পরীক্ষা করছে মহাবিশ্বকে, এই পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু—উদ্ভিদ, প্রাণী, জল, হল, বাতাস, সবকিছু ; যার ফলে সেসব কিছু থেকে আরো উপকার পাওয়া যায়। হাতুঘের ধারণা আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হাতুঘের জ্ঞান। হাতুঘের ধারণা রাজ্যহীন আর জ্ঞান অত্যন্ত কম। সেইজন্য সব কিছু বাচাই করে দেখবার প্রয়োজন, নিজে, হাতে করে আর নিজের চোখে দেখা সম্পর্কে কথাই এবং তা কোনো রকম প্রয়োজনে আসতে পারায়।

তাই ছিল নতুন বিজ্ঞা, এবং ক্রমশ বেশী সংখ্যক লোক এই কাজে ব্যস্ত হচ্ছিল, নতুন কাজ করবার জন্য প্রস্তুত এবং সেজন্য উৎসাহী।

এ ব্যাপারে বই-এর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যদিও অনেক বই-ই আছে। ছেলেটি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, যারা নতুন কাজ হাতে নিজে তাদের একজন হতে হলে তাকে বই-এর সাহায্য নিতেই হবে।

একথা ঠিক, সে ঐ বাড়ীর লাইব্রেরীতে কোনদিন চুকতে পারেনি। আত্মাবলের সামনে মিলার্ডের জন্য অপেক্ষা করা ছিল তার কাজ। যদি সেই বুদ্ধ করেকহিন না আসত ততলে সে বড় জোর একবার বাগানে গিয়ে দেখা করবার সুযোগ পেত। বাই হোক, প্রত্যেক রাতেই বতকণ আলো জ্বলত, পড়বার ঘর সম্বন্ধে তার সৌভাগ্য বেড়েই চলত। সেই ঘরের উল্টো দিকের একটা কোণের ওপর উঠে সে বই-এর আলমারীর সারিগুলো দেখতে পেত।

সে ঠিক করল, পড়া শিখতে হবে।

সেটা অবশ্যই সম্ভব কাজ নয়। পাত্রী সাহেবের কাছে গিয়ে বখন সে তার রনের ইচ্ছা প্রকাশ করল, তখন তিনি ওর দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন খাবার টেবিলে একটা মাকড়সা দেখছেন।

বিরক্ত হয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “গকগুলোকে বুঝি উষ্ণের বাণী পড়ে শোনাতো চাস?” খান্ড না খেয়ে সেখান থেকে চলে আসতে পেরেই ছেলেটি খুশী।

কাজেই তাকে অল্প পথ ধরতে বল।

গ্রামের গীর্জার বেহীতে একটা নিত্য-কর্ম-পদ্ধতির বই থাকত। সেটা সবাই পড়তে পারত, সেজন্য গীর্জার খন্টার দড়িটা টেনে জানান দিতে হত। এখন যদি জানা যেত, পাত্রী সাহেব প্রার্থনা সভায় কোন জায়গা থেকে গেরে শোনাতেন, ততলে শব্দ আর অক্ষরগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বার করা সম্ভব হতো। বাই হোক, ছেলেটি পাত্রী সাহেবের পাওয়া পানগুলো মুখস্থ করতে শুরু করল, অল্পত পক্ষে তার কিছু কিছু। পাত্রী সাহেব অবশ্য শব্দগুলো বিব্রীতাবে অস্পষ্ট উচ্চারণ করতেন, আর সেই নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি তেমন নিরবিত্ত ভাবে পড়তেন না।

তবুও ছেলেটি কিছুদিন পরে পাত্রী সাহেবের করেকটা পানের গুচ্চটা হাইতে শিখে গেল। একদিন বখন সে সেইসব অভ্যাস করছে গোলাবাড়ীর পেছনে বসে তখন আত্মাবলের তার বার ওপর তার কাছে ধরা পড়ে গেল,

কলে বারও খেল। লোকটা জেবেছিল, ছেলেটা পাজী সাহেবকে নিয়ে
তারাশা করছে। এইভাবে তাহলে খান্ধাট অবশেষে খেল ছেলেটি।

পাজী সাহেব কোন জায়গা থেকে গেয়ে শোনাতেন, সেটা বার করা,
অর্থাৎ সঠিক শব্দগুলো কোথায় লেখা আছে সেটাও ছেলেটির পক্ষে বুঝে
বার করা সম্ভব হল না। এমন সময়ে একটা ভীষণ অঘটন ঘটে গেল। বার
কলে তার পড়তে শেখার চেষ্টার প্রথমে ছেঁব পড়ল। মিলড অজুহ হয়ে
পড়লেন, বৃত্ত্য অবধারিত।

তিনি পুরো হেমন্ত কালটা অস্থির রইলেন। শীতকালেও কোনো উন্নতি
হল না। সেই অবস্থায় তিনি খোলা গাড়ীতে চেপে বেশ কয়েক মাইল
দূরের এক খামারবাড়ীতে গেলেন। ছেলেটি সঙ্গে বাবার স্রবোগ পেয়েছিল।
গাড়ীতে পেছন দিকের তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে সে গেল।

বেশা সাক্ষাত করা শেষ হল, বৃদ্ধ তাঁর আপায়নকারীর সঙ্গে কোনো
মতে গাড়ীতে কিরে এলেন, পথে একটা ঠাণ্ডায় জমে বাওয়া চড়াই পাখি
দেখতে পেয়ে হাতের ছাঁড়ী দিয়ে সেটাকে উল্টে দিলেন।

“আশনার কী মনে হয়, কতদিন এটা এখানে পড়ে আছে?” প্রশ্নটা করা
হয়েছিল সেই খামারের মালিককে। ছেলেটি গরম জলের বোতল নিয়ে পেছন
পেছন আসবার সময় তা তুলল। উত্তর হয়েছিল : “এক ঘণ্টা আগে থেকে
কিছু এক সম্ভাব্য হল, কিছা তার চেয়েও বেশী।” বঁটে বৃদ্ধ লোকটি চিন্তিত-
ভাবে এগিয়ে চললেন, তারপর তাঁর আপায়নকারীর কাছ থেকে বেশ
অনামনকভাবে বিদায় নিলেন।

গাড়ীটা জোড়া হলে ছেলেটির দিকে ঘুরে তিনি বললেন, “ডিক্, মাংসটা
এখনো বেশ তাজা আছে।”

বরফ ঢাকা মাঠগুলোর ওপর সন্ধ্যা নেমে আসছিল আর ঠাণ্ডাও বাড়ছিল
জ্বত, তাই তারা পথটা রীতিমত জোর ছুটে পার হয়। তার কলে খামার-
বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার বাক নেবার সময় একটা মোরগ চাপা পড়ে, ওটা
বোধহয় মুরগীর বর থেকে পালিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধ লোকটি লক্ষ্য করেছিলেন
কোচওয়ার হঠাৎ উড়ে আসা মোরগটাকে বাঁচাবার চেষ্টায় গাড়ীটাকে
ঘোরাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল, তখন তিনি ইশারা করলেন গাড়ী
খামাতে।

কমল, চাবর এসবের ভেতর থেকে বেরিয়ে তিনি গাড়ী থেকে নামলেন,

ছেলেটির কাঁধে ভর দিয়ে বেখানে বোরগটা পড়েছিল সেখানে গেলেন,
কোচওয়ার বাইরের ঠাঁওয়ার কথা বললেও তা গ্রাহ্য করলেন না।

বোরগটা মরে গেছে।

বুদ্ধ বললেন ওটাকে তুলতে।

“নাড়ি-খুঁড়ি সব বার করে ফেল”, হুহু করলেন।

কোচওয়ার বলল, “ওটা রাসাখরে নিয়ে গিয়ে করলে হতো না!” তার
ওকথা বলার কারণ, তাহের মালিক সেই ঠাঁও হাওয়ার প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন
সেটা লে লক্ষ্য করেছিল।

“না, এখানে করাট ভাল”, তিনি বললেন, “ডিক্-এর কাছে নিশ্চয় একটা
ছুরি আছে, আর আমাদের বরক বরকার।”

ছেলেটি আহেশ অহুসারে কাজ করল, আর সেই বুদ্ধ, মনে হল বেন তাঁর
অহুহতা আর ঠাঁওয়ার কথা তুলে গেছেন, নিজেই খুঁকে পড়ে মূঠো মূঠো বরক
নিলেন বহু কষ্টে। বহু করে সেই বরক দিয়ে ভরে দিলেন বোরগটার ভেতরটা।

ছেলেটি বুঝতে পেরে গেছে। সেও বরক তুলল, তার শিক্ষককে দিল,
এরনি করে বোরগটার ভেতরটা সম্পূর্ণভাবে বরকে বোকাই করা হল।

“এবার এটার চুচার সপ্তাহ ডালা থাকবার কথা”, বললেন সেই বুদ্ধ
উদ্বেজিত ভাবে, “এটাকে আমাদের মাটির নীচের ঘরের পাখরের ঘোরের ওপর
রেখে দাও!”

ঐ সামান্য পথটুকু হেটেই গেলেন, একটু পরিশ্রান্ত আর ছেলেটার কাঁধে
বেশ ভর দিয়ে, ছেলেটার বগলতলার বরক ঠাসা বোরগ।

হলঘরে ঢুকতেই বাইরের সেই ঠাঁওয়ার প্রভাবে তিনি কাঁপতে শুরু করলেন।

পরদিন সকালে প্রচণ্ড জ্বরে বিছানা নিলেন।

ছেলেটি চিন্তিতভাবে এতকি ওতকি বোরাকেরা করত, চেষ্টা করত তার
শিক্ষকের অবস্থার কথা জানতে। সে সামান্যই জানতে পারল, সেই বিশাল
খামারবাড়ীর সাধারণ জীবনে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। অবশেষে
তৃতীয় দিনে একটা ঘটনা ঘটল। তাকে পড়বার ঘরে ডেকে পাঠানো হল।

সকল একটা জুজোপোষের ওপর অনেকগুলো কবল চাপা বেওয়া অবস্থায়
বুড় ভরে, তবে জানালাগুলো খোলা, কল ভেতরটা ঠাঁও। তা সন্ধ্যাও
রৌদ্রকে উজ্জল দেখাচ্ছিল। তিনি কাঁপা কাঁপা ঘরে বরক ঠাসা বোরগটার
অবস্থার কথা বিজ্ঞান করলেন।

ছেলেটি জানাল, ভীষণ ভীষণ বেখাচ্ছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি।

“শব্দ শুভ”, বললেন বুদ্ধ লজ্জিতভাবে। “হুগিন পরে এসে আবার খবর দিয়ে যেও!”

চলে আসবার সময় ছেলেটির দুঃখ হচ্ছিল বোরগটা লড়ে করে নিয়ে যায়নি বলে। চাকর-বাকরদের মহলে বড়টা শোনা গেছিল, বুদ্ধ লোকটিকে দেখে ততটা অস্থির মনে হল না।

ছেলেটি দিনে ছুবার করে নতুন করে বরফ ঠালতে শুরু করল বোরগটার পেটে, আর ছেলেটি আবার যখন রোগীর ঘরের দিকে রওনা হলো তখনো বোরগটা টাইকা অবস্থা একটুও হারায় নি।

ছেলেটি অস্বাভাবিক বাধা পেল।

শহর থেকে ডাক্তাররা এসেছে। করিডোরে ফিস্‌ফিস্‌, হুকুম আর তালিমের শব্দ, আর সর্বত্র অচেনা মুখ। একটা চাকর মস্ত একটা কাপড় নিয়ে ঢাকা স্ট্রেট নিয়ে হাচ্ছিল রোগীর ঘরের দিকে, সে তাকে ধমকে ভাগিয়ে দিল।

সারাটা সকাল সারাটা নিকেল সে বহুবার বুখা চেষ্টা করল রোগীর ঘরে পৌঁছানো। মনে হল ঐলব অচেনা ডাক্তারেরা সেই প্রাণাধর্মী রয়ে বাগার চেষ্টা করছে। ওদের দেখে ছেলেটির মনে হচ্ছিল যেন সব বিশাল বিশাল কালো পাখি, তারা একজন রোগীর ওপর চেপে বসেছে, বেচারী রোগী অসহ্য। সন্ধ্যার দিকে সে করিডোরের একটা ছোট আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রইল, ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা। শীতে কাপড়ে থাকল সমানে, তার মনে হল সেটা একদিক দিয়ে ভাল, কারণ এক্সপেরিমেন্ট-এর খাতিরে বোরগটাকে অতি অবশ্য ঠাণ্ডার মধ্যে রাখার দরকার।

রাতের খাবারের সময় কালো বন্যার ভাটা পড়ল খানিকটা, ছেলেটি চুপিসারে রোগীর ঘরে ঢুকে পড়বার সুযোগ পেল।

রোগী একা শুয়ে, সবাই বেতে গেছে। ছোট্ট বিছানাটার পাশে একটা পড়বার আলো ঝাঁক করােনো, সেটার সবুজ ঢাকনা দেওয়া। বুদ্ধ লোকটির মুখটা অকৃত স্তব্ধ, মনে হচ্ছিল মোহের মত সাহা। চোখ দুটো বোকা, কিন্তু হাত দুটো অস্থিরভাবে চাকরের ওপর নড়ছিল। ঘরটা খুব গরম, জানালাগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ছেলেটি বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল, বিকারপ্রবৃত্তির মত বোরগটা এগিয়ে ধরা, ভারপূর্ণ হাড্ডা করে অনেকবার বলল, “মিলেও”। কোনো

উত্তর পেল না। তার মনে হল না, রোসী ঘুমোছেন, কারণ চোঁট ছোটো
নড়ছিল বেন কথা বলছেন।

ছেলেটা ঠিক করল, তাঁর নজরে আসতে হবে, কারণ এক্সপেরিমেন্ট-এর
কাজ আর যা করতে হবে তার প্রয়োজনীয়তা সে বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছিল।
কিন্তু কবলের চাকনার কাছে পৌঁছবার আগেই—(কুড়ির মধ্যে বস করে
রাখা মোরগটা একটা চেয়ারের ওপর রেখে দিতে হয়েছিল) টের পেল, কে
বেন তাকে পেছন থেকে ধরে টেনে সরিয়ে আনল। অন্ধকার মুখওয়ালা
একটা মোটা লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে একটা খুনীর মত। ছেলেটা
বেগতিক বেধে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক ছুটে কুড়িটা নিয়ে সরল গিয়ে
বাঁইরে পালাল।

করিডোরে এসে মনে হল, ছোট বাটলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার সময়
তাকে বুঝি দেখে ফেলেছে। সেটা মুন্সিলের কথা। ও কি করে প্রমাণ
করবে, একটা লকরী এক্সপেরিমেন্ট চালাবার জন্য মিলড-এর হুকুম মতই সে
ওখানে গেছিল? বুদ্ধ লোকটি সম্পূর্ণভাবে ডাক্তারদের কবলে, তাঁর ঘরের
বন্ধ কানালোগুলোই তার প্রমাণ।

সে সত্যিই দেখল, একজন চাকর চক্কর পার হয়ে আন্তাবলের দিকে গেল।
তাই রাতের খাওয়ার চিন্তা ত্যাগ করতে হল, মোরগটাকে হাটির নীচের
ঘরে রেখে এসে, বিচালি গালায় গিয়ে ঢুকল গুড়ি ঘেঁরে।

তার মাথার ঘুরছে সেই পল্লীকার কথা, ফলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না।
খুব ভয়ে ভয়ে সে তার লুকোনোর তারগা থেকে বের হল পরদিন সকালে।

কেউই ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছিল না। সেট বিশাল বাড়ীতে এক
জন্যা টানাশোড়েন চলছে। মিলড সকালের দিকে মারা গেছেন।

ছেলেটা সারাটা দিন ঘুরে বেড়াল, বেন মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে
ফেলেছে। তার মনে হচ্ছিল, তার শিক্ষকের এই বিরোধঘষণা সে কখনো
ভুলতে পারবে না।

বিকেল পড়িয়ে গেলে সে বখন এক পায়লা বরক নিয়ে হাটির নীচের
ঘরে পেল তখন তার হুচিন্তা ঠাণ্ডাল শেষ না-করা সেই এক্সপেরিমেন্ট-এর
হুচিন্তার, তখন চোখের জলে কুড়িটা ভাসিয়ে দিল। এই বিশাল আবিকারের
কী হবে?

সেই বিশাল বাড়ীতে কিসে বাবার সময় তার পা ছোটো এত ভারী মনে

হল যে সে কিরে বরফের ওপর তার পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে দেখল, ওগুলো আগের চেয়ে বেশী গভীর কিম্বা—, কিরে জানতে পারল লওন-এর ডাক্তাররা তখনো কিরে যায়নি। তাদের পাড়ীগুলো তখনো সেখানে রয়েছে।

তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ঠিক করল, ওদের কাছে সেই এক্সপেরিয়েন্ট-এর গুরুত্ব ঠিকই বুঝবে। সে বরফে কমানো যোগ লম্বত ছোট খুঁড়িটা নিয়ে এল তারপর গিয়ে পাড়াল ইয়ারার পেছনে, লুকিয়ে রইল বতকণ না এই ত্রলোকদের একজন, দেখলে ভেমন ভয় লাগে না এমন একজন ছোটখাট লোক এগিয়ে এল। এগিয়ে গিয়ে সে তার খুঁড়িটা এগিয়ে ধরল। প্রথমে তার গলার স্বর আটকে গেল, তারপর অবস্ত ডাড়া-ডাড়া কথায় তার বক্তব্য পেল করতে পারল।

“ছ’দিন আগে মিলড এটাকে বরা অবস্থায় পান—এক্সপেল, আমরা এটার পেটের মধ্যে বরফ দিয়ে রেখেছি। মিলড-এর ধারণা ছিল, এটা তাজা থাকবে। নিজেই দেখুন! এটা একদম তাজা রয়ে গেছে।”

ছোটখাট লোকটি অবাক হয়ে খুঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

“বেশ তো, তারপর?” জিজ্ঞাসা করল।

“এটা নষ্ট হয়নি”, ছেলেটি বলল।

“আচ্ছা”, বলল সেই লোকটি।

“নিজেই দেখুন না”, বলল ছেলেটি ব্যস্ত ভাবে।

“দেখছি”, বলল সেই ছোটখাট লোকটি, তারপর মাথা নাড়ল। মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

ছেলেটি হতাশ ভাবে তার বাওয়া দেখল। এই ছোটখাট লোকটাকে সে বুঝে উঠতে পারল না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে সেই বৃদ্ধ লোকটি এই এক্সপেরিয়েন্ট শুরু করেননি, আর তার ফলেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনেননি? নিজের হাতে তিনি মাটির ওপর থেকে বরফ তুলেছিলেন। সেটা ঘটনা।

সে আন্তে আন্তে বাটির নিচের বরের দরজার দিকে রওনা হল, দরজার কাছাকাছি গিয়ে কিছু পাড়িয়ে পড়ল, তারপর চট করে ঘুরে রহুইখানার দিকে ছুট দিল।

সেখানে রাঁধুনী লোকটাকে বেশ ব্যস্ত দেখল, রাতের খাওয়ার সময় আশপাশের সকল থেকে অনেক লোক আসবে আশা করা হচ্ছিল।

“ওই পাখিটা আবার আনলি কেন?” বিরক্ত ভাবে বিঁচিয়ে উঠল রাধুনী। “এটা বেখানি ভবে একবার বরক হয়ে গেছে।”

“তাতে কিছু কতি নেই”, ছেলেটি বলল, “মিলত বলতেন, তাতে কিছু কতি হবে না।”

রাধুনী ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল অকতনকভাবে, তারপর ব্যস্তভাবে মত্ত ফ্রাইং প্যানটা হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিছু একটা কেলে দিতে বোধহয়।

ছেলেটা জুড়ি সমেত তার পেছন পেছন গেল, নাড়োড়বান্ধা।

“একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না?” জিজ্ঞেস করল মিনতি ভরা স্বরে।

রাধুনীর খৈর্ষে আর কুলোল না। তার মোটা মোটা হাতজুটো দিয়ে মোরগটা তুলে নিয়ে এক ঝটকায় ছুঁড়ে কেলে হিল উঠানের ওপর।

“তোমার মাখায় আর কিছু আসছে না?” ফংকার দিয়ে উঠল দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, “এদিকে হিজ লর্ডশিপ মারা গেছেন।”

জুজুভাবে ছেলেটি মোরগটা তুলে ‘নল বাটির ওপর থেকে তারপর সেটা নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

পরের দুটো দিন সমাধির আরোজনে কেটে গেল। ছেলেটাকে বোড়ার গাড়ী জোড়া আর বোড়া আলগা করা য খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অনেক সময় চোখ খোলা অবস্থাতেই ঘুমিয়েছে। তারই মধ্যে জুড়িতে টাটকা বরক ঢেলেছে। তার কাছে সবই অর্থহীন মনে হল, নতুন যুগ শেষ।

কিন্তু তৃতীয় দিনে, বেদিন শেবকৃত্য হবে, সেদিন আন করে সবচেয়ে ভাল পোশাক পরবার পর তার উৎসাহ একটুও কমেছে বলে মনে হল না। জন্মের রোদুয়ে ভরা শীতকাল, গ্রামের পিঁজার ঘণ্টার শব্দ।

নতুন আশার ভরপুর হয়ে সে বাটির নিচের ঘরে গেল, মরা মোরগটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল অনেকক্ষণ ধরে। ওটার মধ্যে পচে ওটার কোনো লক্ষণ দেখল না। সাবধানে সেটাকে একটা বাজের মধ্যে ভরল, সেটাকে পরিষ্কার সাফা বরক দিয়ে ভরল, তারপর সেটা বগলদাবা করে গ্রামের দিকে রওনা হল।

ঘরের আনন্দে শিশু দিতে দিতে সে তার ঠাকুয়ার নিচু রাসাঘরে গিয়ে হুকল। তার বাবা-মা আর বরলে মারা গেছিল বলে ঠাকুয়ার কাছেই সে বড় হয়েছে আর ঠাকুয়ার ওপর তার ভরসা খুব।

বাস্তবিক আছে এনা দেখিয়ে ছেলেটা প্রথমে সেই বুড়ীকে মিলড-এর এক্সপেরিয়েন্ট-এর কথা বলল।

ঠাকুরা তখন কবরখানার বাবার জন্য পোশাক পাঠাচ্ছিল।

ঠাকুরা ধৈর্য ধরে ওর কথা শুনল।

“কিন্তু সেকথা তো সবাই জানে”, সে বলল। “ঠাকুরা করে দায় আর কিছুদিন ঠিক থাকে। এটা আর নতুন কথা কী?”

“আমার মনে হয়, ওটা খাওয়া দায়”, বলল ছেলেটা আর চেঁচা করল বড়টা সম্ভব উদাসীন থাকতে।

“এক সপ্তাহ আগে মরা একটা মোরগ খাওয়া? ওঁতাতো বিষ!”

“কেন? ওটা যদি আগের মতই থাকে, মরার সময় যেমন ছিল? তাহাড়া ওটা মিলড-এর কোচওয়ান মেয়ে কেলেছিল, তার মানে অস্বস্থ ছিল না।”

“কিন্তু ভেতরে ভেতরে, ভেতরে ভেতরে ওটা পচে গেছে!” বুড়ী বলল, একটু অশৈথ্ব্য হয়ে উঠেছে।

“আমার মনে হয়না”, ছেলেটি বলল তোর দিয়ে, তার পরিষ্কার লুটি মোরগটার ওপর। “ভেতরে তো সারাটা সময় বরফ ছিল। তাবচ্ছ ওটা রান্না করব।”

বুড়ী বিরক্ত হয়ে উঠল।

“তুই আমার সঙ্গে কবরখানার যাবি”, বলল ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে। “চিচ্-লর্ডশিপ তোর জন্য অনেক করেছেন বলে আমার ধারণা, তাই তাকে ভদ্রভাবে তাঁর কবিনের পেছন পেছন যেতে হবে।”

ছেলেটা তার কথার উত্তর দিল না। বুড়ী যখন কালো উলের মাক্সার মাথায় জড়াক্কে, তখন সে বরফের ভেতর থেকে মোরগটা বায় করল, হুঁ দিয়ে সব বরফ উড়িয়ে দিল, তারপর সেটাকে উত্তরের সামনে দুটো কাঠের ওপর রাখল। সবটা বরফ করিয়ে ফেলতে হবে।

বুড়ী তার দিকে আর তাকায়নি। নিজে তৈরী হয়ে ছেলেটার চাত ধরল তারপর তাকে কোনো হুযোগ না দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কেশ খানিকটা পথ ছেলেটি অহুগতের মত সঙ্গে গেল। আরো অনেক লোক তখন পথে, সবাই চলেছে কবরখানার দিকে, অনেক পুরুষ আর মেয়ে। হঠাৎ ছেলেটা ব্যাখার চিংকার করে উঠল। তার একটা পা বরফের খাঁজে আটকে গেছে। মুখ বিকৃত করে সে সেটা টেনে বার করল, খোঁড়াতে

খোঁড়াতে হাঠের ওপর পড়ে থাকা একটা পাথরের কাছে গিয়ে তার ওপর বসল, সেখানে বসে পারে হাত বখতে থাকল।

“বেকারদার পা পড়েছিল”, বলল ছেলেটি।

বুড়ী ওকে দেখল সম্বন্ধের চোখে।

“কিন্তু তুই তো ঠাটতে পারবি”, বলল।

“না”, বলল ছেলেটি বিড়বিড় করে। “তবে বিশ্বাস না হয়, বস আমার পাশে, বতকণ ব্যথাটা না করে।”

বুড়ী কোনো কথা না বলে বসল ওর পাশে।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। তখনো গ্রামের লোকেরা আসছে, তবে অবশ্যই ল'খায় ক্রমশ কম। ওরা দ্রুত বসে রইল জেন কবে রাস্তার ধারে।

তারপর বুড়ী বলল গম্ভীর ভাবে :

“উনি তোকে দেখাননি যে যিখো বলতে নেই ?”

ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না। বুড়ী নিঃশ্বাস কেলে উঠে ঠাড়াল। তার শীত করছে।

“ক'শ মিনিটের মধ্যে যদি না আসিল, তাহলে তোর দাঁতাকে বলে দেব, ও তখন সোকে আছা করে পেটাবে।”

এইকথা বলে টলতে টলতে রওনা হল, একটু ত্যাড়াতাড়ি, যাতে শেখকতোর সময় বয়ে না যায়।

বুড়ী বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে ছেলেটি ধীরে হুহু উঠে ঠাড়াল। সে ধীরে যেতে শুরু করল, তবে তখনো বারে বারে ফিরে দেখছিল আর খোঁড়াছিল আরো কিছু সময়। যখন একটা কোণ তাকে বুড়ীর চোখের আড়াল করল তখন সে আবার আত্মাধিক ভাবে ঠাটতে শুরু করল।

কুঁড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে মোরগটান পাশে বসল, অনেক আকাখা নিয়ে ওটার দিকে দেখল। ওটাকে একটা ডেকচিতে সেদ্ধ করবে তারপর একটা ডানা ধাবে। তখন বোকা ধাবে, ওটা বিবাক্ত হয়ে গেছে কিনা।

অনেক দূর থেকে ভিনবার কামান হাগার আওরাক শোনা গেল। ফালিস বেকন, ডেকলার-এর ব্যারন, ডাইকাউন্ট সেন্ট আলবেন, একটা ইংল্যান্ডের প্রধান লর্ড চ্যান্সেলর, যিনি তাঁর সরকারী লোকেরের মধ্যে শুধু যথেষ্ট স্থানই উত্ত্বেক করেননি, আরো অনেকের মধ্যে বিজ্ঞানের উপকারিতা সবচেয়ে উৎসাহ বহী করেছিলেন, তাঁকে ল'খান দেখাবার উদ্দেশ্যে ঐ ভোপজনি।



বিক্রোধী লোকটির গুভারকোট

শোলায় সেই লোকটি, যাকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বিচারসভার আমলারা প্রচলিত ধারণার বিরোধিতার দ্বারা কার্ঠের পাদার পুড়িয়ে মেরেছিল, সেই গিয়োর্ডানো ক্রনো এমনিতে একজন বিশাল পুরুষ বলে গণ্য। তাঁর স্মৃতি এবং মর্যাদাশে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের সেই তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্যই শুধু নয়, বিচার-সভার সামনে তাঁর দুঃসাহসী আচরণের জন্যও। ওদের তিনি বলেছিলেন : “তোমাদের এই রায় শুনে আমি যতটা ভয় না পাচ্ছি, তার চেয়ে অনেক বেশী ভয় তোমরা বোধ হয় পাচ্ছ। আমার বিরুদ্ধে এই রায় দিতে।” তাঁর লেখাগুলো পড়লে এবং সেইসঙ্গে তাঁর জনসাধারণের সম্মুখীন হবার বিবরণগুলিতে একবার নতুন বোলালে, তাঁকে একজন বিশাল পুরুষ বলে মনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি থাকে না। তা ছাড়াও একটা গল্প আছে, যা থেকে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকা আরাে হরতো বাড়তে পারে। সেটি তাঁর গুভারকোটের কাহিনী।

জানা দরকার, কিভাবে তিনি বিচারসভার পাদার পড়েন।

ভেনিসের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নাম মোকেনিগো, একবার সেই পণ্ডিতকে তার বাড়িতে নিয়ন্ত্রণ করে, উদ্বেগে তাঁর কাছ থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং মনো-রাখবার কৌশল ভেদে নেওয়া। কয়েক মাস ধরে তাঁর পরিচর্যা করবার পর তার পরিবর্তে সে পেল চুক্তিমত জ্ঞান। কিন্তু সে আশা করছিল কিছু তুচ্ছ-তাক লিখে নেবে, তার বহলে শেল শুধু এসব প্রকৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্ব। তাতে সে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ ওসব তার কোনো কাজে লাগবে না। এই অভিযির পেছনে তার যে খরচ হয়েছিল সেজন্য তার আপশোশ হচ্ছিল। বহুবার সে তাঁকে বিশেষভাবে উপরোধ জানিয়েছিল, ওসব বাদ দিয়ে রহস্যময় এবং লাভ হয় এমন কিছু শেখাতে; তাঁর মত বিখ্যাত লোকের তো সেসক জানা থাকবার কথা। কিন্তু তাতেও যখন কোনো লাভ হল না, তখন সে বিচারসভার কাছে চিঠি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করল। লিখেছিল, এই

অন্য এবং অকৃত্রিম লোকটি তার সামনে বীতভূমি সবচেয়ে ধারাল কণা বলেছে, হৃৎকণের সবচেয়ে বলেছে, তারা নাকি সব গরুত এবং দেশের লোকদের বোকা বানিয়ে রেখেছে, তাছাড়াও এর বক্তব্য, বাইবেলের বর্ণনার পরিপন্থী, একটি রাজ্য হ'ল নয়, অসংখ্য হৃৎকণের অস্তিত্বের কথা, ইত্যাদি, প্রকৃতি। সে, বোকেনিগো সেইজন্য তাকে ছাড়ের ঘরে তালি দিয়ে রেখেছে এবং অকৃত্রিম জানাচ্ছে, বলা শব্দ সব আশঙ্কা পাঠিয়ে তাকে নিয়ে বেতে।

আমলায়ও এসেছিল এক রবিবার আর সোমবারের থাকের রাজ্য এবং সেই পণ্ডিতকে নিয়ে যার বিচারসভার বন্দীশালায়।

এই ঘটনা ঘটেছিল ২৫শে মে, ১৫২২ সালে, সোমবার ভোর প্রাঙ্গণ তিনটির সময়, আর সেই দিন থেকে যেদিন তিনি কাঠের চিতার ওঠেন, সেই ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬০০ সালের মধ্যে নোদার সেই লোকটি আর বন্দীশালার বাইরে আসেননি।

সেই জননা বিচার যতদিন চলেছিল সেই আট বছর ধরে তিনি তাঁর জীবন-কথা অকৃত্রিম সংগ্রহ চালিয়ে গেছেন, অবশ্য প্রথম বছরে যখন তাঁকে জেষ্ঠ্য থেকে রয়েছে পাঠ্যবার ব্যবস্থা করা হয়, তখনকার একটা প্রচেষ্টা সবচেয়ে এই তত্ত্বাবধি করে দেয়।

উ. ওয়ারকোটের কাচিনী সেই সময়ের।

১৫২২ সালের শীতকালে, তখন তিনি একটা হোটেলে থাকেন, গাব্রিয়েলে ওয়াল্টো নামে এক চাকির কাছে যেটা একটা ওয়ারকোটের স্থাপন দেন। যখন তাঁকে প্রেক্ষার করা হয় তখনো ওটার স্থান দেখা যায়।

প্রেক্ষারের খবর পাওয়া হাজি হাজিটি ছুটে যায় বোকেনিগোর বাড়ীতে, সেটা সেই সামুয়েল-এর কাছাকাছি, সেখানে সে তার পাণ্ডার বসিধ পেশ করে। ততক্ষণে অনেক ঘেরা হয়ে গেছে। বোকেনিগোর এক কর্মচারী তাকে সবার দরজা বেঁধিয়ে দেয়। "এই জোক্তোরটার পেছনে আমরা অনেক খসড়া করেছি", এই কথা সে এত দোষ চিৎকার করে বলে যে কিছু পথচারী কিনে তাকায়। "বরং বর্মীর আদালতের ট্রাইবুনালের কাছে ছুটে যান, সেখানে গিয়ে বলুন যে আপনার সঙ্গে এই নিরোধী লোকটির যোগাযোগ আছে।"

হাজিটি ওয় পেরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। সেই গলির এক দৃশ্য ছোঁকরা সব জনেছিল, তাদের মধ্যে একজন, একটা সর্বাঙ্গে শুভি ওঠা লোক

বেঁটে ছোকরা তাকে একটা ডিল চুঁড়ে রাখে। অবশ্য একটা পরিবী পোশাক পরা মহিলা একটা হরকা খুলে বাইরে এসে ছোকরাটাকে একটা চড় কবিরেছিল, তবে ৭৯শতাব্দীর বয়স হয়েছে, সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, “সেই বিরোধী লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ থাকা” তার পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। সে লক্ষ্যের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে মোড় ঘুরে অনেক দূর পথে বাড়ী গেল। তার জুঁতাগোর কোনো কথা তার স্ত্রীকে বলল না, আর তার স্ত্রী এক সপ্তাহ ধরে তার এই মনমরা ভাব দেখে অবাক হল।

কিন্তু পরলো জুন তারিখে হিসাব লিখতে গিয়ে সে দেখল, একটা গুভারকোটের দাম পাওনা আছে এমন একজন লোকের কাছে যার নাম তখন সকলের মুখে মুখে ঘুরছে; নোন্সার লোকটি তখন শহরের আলোচনার বিষয়। লোকটার মন্ব স্বভাব সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সব গুজব শোনা যাচ্ছিল। লোকটা শুধু বই-এ বা বক্তৃতার বিবাহের পবিত্রতাই নোংরাযিতে টেনে নামায়নি, বরং যীশুখ্রীষ্টকেও একটা ভণ্ড বলেছে, তাছাড়া দূর্ব্যম্বন্ধে ভীষণ অসুস্থ সব কথা বলেছে। সে যে তার গুভারকোটের দাম দেবে না, এতো জানা কথা। সেই ভালমাসের মহিলাটির এই কতি স্বীকার করে নেবার কোনো রকম ইচ্ছাই ছিল না। স্বামীর সঙ্গে বেশ এককথা কথা কাটাকাটির পর সেই সন্তর বছরের বুড়া তার সবচেয়ে ভাল পোশাকে গেজে ধর্মীর বিচার সভা যে বাড়ীতে বসে সেখানে গিয়ে হাজির হল, তারপর রাগী ভাবে বক্ত্রি কুড়ি দাবী করল, সেই বিরোধী লোকটার কাছে তার গুটা পাওনা।

যার সঙ্গে সে কথা বলেছিল সেই কর্মচারীটি তার দাবীর কথা লিখে রাখল আর কথা দিল, ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া হবে।

তারপর দু-চারদিনের মধ্যেই ৭৯শতাব্দী একটা খবর পেল দেখা করতে যাবার, আর কাপতে কাপতে এবং ভয়ে ভয়ে সে গিয়ে হাজির হল সেই ভীষণ বাড়ীটার। সে অবাক হয়ে পেল যখন তাকে কেউ কোনো রকম জেরা করল না, বরং তাকে জামিয়ে দেওয়া হল কেবল যে প্রেক্ষতার করা লোকটির আদিক প্রসঙ্গ উঠলে তার দাবীর কথা বিবেচনা করা হবে। তবে কর্মচারীটি আতালে জামিয়ে দিল, তাতে খুব একটা লাভ হবে না।

এত সম্বন্ধে নিস্তার পেয়ে বুড় লোকটি এত খুশী হল যে খুব বিনীত ভাবে ধন্যবাদ জানাল। কিন্তু তার স্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারল না। সেই কতি পূর্বের

কিন্তু তার দাবী সত্যের আভা হেঁকে অনেক রাত অবধি সেলাই করবে, তা যথেষ্ট নয়। কাপড় বার কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তার কাছে হেনা আছে, সেটা শোধ করতে হবে। বহিলাটি রাসায়নে আর উঠানে চিংকার করে বেড়াতে লাগল যে একজন চক্ৰবর্তীকে তার হেনা শোধ করার আগে হাজতে পুরে রাখা ব্যাপারটা লজ্জার। সে দরকার হলে রোমে পবিত্র শিতার কাছেও যাবে, তার বহিলা ছুঁড়ি আহার করতে। “চিৎকার ওঠবার সময় তার ওভারকোটের দরকার হবে না”, বলে চেঁচামেচি করল।

তার কাছার কমফেসর-এর কাছে গিয়ে তাদের এই সর্বনাশের কথা বলল। তিনি পরামর্শ দিলেন, অন্তত ওভারকোটটা তাদের ফেরত দেওয়া হোক এই দাবী জানাতে। সে তাতে বুঝল যে গীতার বিচারে স্বীকার করা হচ্ছে যে তার দাবী করবার অধিকার আছে, এবং জানাল, ওভারকোটটা নিশ্চয় ব্যবহার করা হয়ে গেছে, তাছাড়া ওটা হাপ নিয়ে বানানো হয়েছে, তাই ওটা পেয়ে সে কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারবে না। সে হাম চায়। উত্তেজিত হয়ে এই কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর একটু উচুতে তুলেছিল বলে পাত্রীটি তাকে বাইরে বার করে দিল। তার ফলে তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হল, কয়েক সপ্তাহ চূপচাপ থাকল। ধর্মীয় বিচার সভার সেই বাড়ী থেকে গ্রেফতার হওয়া বিরোধী লোকটির ব্যাপারে আর কোনো খবর নেই। তবে সর্বত্র কানাপুসা শোনা যাচ্ছিল যে জেরার উদ্বেগ সাংবাদিক সব অপরাধ প্রকাশ করা। এইসব গুজব বুড়ীটি ব্যগ্রভাবে শুনে বেড়াচ্ছিল। বিরোধী লোকটার অবস্থা এত খারাপ জেনে সে বেশ কষ্ট পাচ্ছিল। লোকটা কোনোদিনই আর ছাড়া পাবে না আর তার হেনাও শোধ করতে পারবে না। বুড়ীর আর খুম হয়না রাতে। তাবপর আগষ্ট মাসের পরমে যখন তার দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণভাবে বিকস্ম, তখন যেখানে সে কেনাকাটা করতে যেত কিংবা বেসব খন্ডের পোশাক পরে দেখতে আসত তাদের কাছে তার অভিযোগ হুযোগ পেলেই কলকলিয়ে বলতে শুরু করল। তার বক্তব্য ছিল, পাত্রীরা এক পাপ করবে যদি তারা একজন সাহায্য কারিগরের দাবীর ব্যাপারে উদাসীন হয়। ট্যাক্স-এর চাপ বাড়ছে, আর কটির দাবিও এই কদিন আগে বেড়েছে।

একদিন সকালের দিকে এক কর্মচারী এসে তাকে ধর্মীয় আদালতের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে তাকে স্পষ্টভাবে সাক্ষাৎ করে দেওয়া হল, তার এই কৃত্ত বক্তব্যনি খারাপ হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,

সামান্য কটা ছুড়ির জন্য একটা প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ লোকের মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর জন্য তার লজ্জা হয় কিনা। তাকে জানিয়ে দেওয়া হল, তার মত লোককে ঠাণ্ডা রাখবার সমস্ত ব্যবস্থাই আছে।

তাতে কিছুকালের জন্য কল হল, যদিও একজন পাত্রীর চোখা থেকে উৎসর্গে দেওয়া “সামান্য কটা ছুড়ির জন্য” কথা কটি বলার ধরনের কথা মনে এলেই বিরক্তিতে মুখটা তার লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেপ্টেম্বরে পোনা গেল, রোমের ধর্মীয় বিচারসভার প্রধান আবেশ করেছেন, নোনার লোকটিকে পাঠিয়ে দেবার, সিনোরিয়াকে গুনানি হবে।

এই পাঠিয়ে দেবার চেষ্টার ব্যাপারে শহরের সব লোক আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের মত এই পাঠানোর বিপক্ষে। রোমের বিচার সভা তাদের ওপর খবরদারি করবে, এটা কেউ চায় না।

বুড়ীটার অবস্থা কাহিল। বিরোধী লোকটাকে কি সত্যি সত্যিই তার দেনা মেটানোর আগে রোমে যেতে হবে? যথেষ্ট হয়েছে। এই অবিস্থান্য পুর প্রভেতে না প্রভেতে, একটা ভাল ঝাঁট পরবার সময়ও নষ্ট না করে, সে ধর্মীয় আদালতের বাড়ীর পথে রওনা হল।

এবার একজন বড় কর্মচারী তার সঙ্গে দেখা করল, আগের কর্মচারীদের তুলনায় এ লোকটি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যবহার করল। লোকটির বয়স প্রায় তার নিজের বয়সের সমান আব সে তার নালিশ ঠাণ্ডা মাধ্যম মনযোগ দিয়ে শুনল। বুড়ীর কথা শেষ হলে সে একটু সময় চুপ থেকে প্রশ্ন করল, সে ক্রনোর সাথে দেখা করতে চায় কিনা।

বুড়ী তৎক্ষণাৎ রাজী হল। পরদিন তাদের দেখা করার ব্যবস্থা করা হল।

সেদিন সকালের দিকে লোটার গরাদ দেওয়া জানালাওয়ালা একটা ছোট্ট ঘরে বুড়ীর কাছে এল একজন বেঁটে, বোকা লোক, তার মুখে হাতা কালো লাড়ি। লোকটি এলে বিনীতভাবে তার দাবীর কথা জানতে চাইল।

সেই মাপ নেবার সময় বুড়ী তাকে দেখেছিল আর এই এতদিন তার মুখটা বেশ ভাল মনে ছিল, এখন কিন্তু দেখামাত্র চিনে উঠতে পারল না। জেরার উত্তেজনার কলে নিশ্চয় তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে।

বুড়ী তাড়াতাড়ি করে বলল, “ওতারকোটটা। আপনি ওটার দাম দেননি।”

লোকটি একটু সময় অবাক ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার নংবিং ফিরল, আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল: “কত দাম আছে আপনার কাছে?”

“বজ্রিণ হুড়ি”, বলল বুড়ী, “আপনি তো রসিদ পেয়েছিলেন।”

একজন লম্বা চওড়া কর্মচারী পাচারার ছিল, লোকটা তার বিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, সে জানে কিনা, তার সম্পত্তি হিসেবে যেট কি পরিমাণ অর্থ এই ধর্মীর বিচারসভার বাড়ীতে জমা দেওয়া হয়েছে। সে লোকটি তা জানত না, তবে অবস্থা কথা ছিল, সেটা দেখবে।

“আপনার খারী কেমন আছে?” জিজ্ঞাসা করল সেই বন্দী, আবার বুড়ীর বিকে কিয়ে, যেন সেই সঙ্গে ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে এবং আত্মবিক সম্পর্ক কিয়ে এসেছে, প্রচলিত দেখা-সাক্ষাতের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

আর এট ছোটখাট লোকটির সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে সেই বুড়ী বিড়বিড় করে বলল, তার খারী ভাল আছে, এমনকি সেই সঙ্গে তার বাতের স্বপ্নার কথাও জুড়ে দিল।

সেই ধর্মীর আদালতের বাড়ীতে সে গেলও আবার দুদিন পরে, কারণ তার মনে হয়েছিল, তত্ৰলোককে খোঁজ খবর করবার জন্য একটু সময় দেওয়াটাই উচিত কাজ।

সত্যি সত্যিই সে সেই লোকটির সঙ্গে আবার দেখা করবার অত্মমতি পেল। তাকে অবশ্য সেই লোকটার পরাম দেওয়া জানালাগুলো ছোট্ট ঘরটিতে এক খট্টারও বেশী অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ তখন লোকটাকে জেরা করা চলছিল।

লোকটি এল আর তাকে দেখে খুব ক্লান্ত মনে হল। আর একটাও চেয়ার ছিল না বলে লোকটা দেয়ালে সামান্য হেলান দিয়ে ঠাডাল। বাইহোক লোকটি তৎক্ষণাৎ কাজের কথা শুরু করল।

খুব ছুঁল য়রে লোকটি বলল, ওভারকোটটার দাম দেবার মত অবস্থা তার নেই বলে সে লজ্জিত। তার সম্পত্তির মধ্যে একটা হুড়িও পাওয়া যায় নি। তবুও তার সব আশা ত্যাগ করবার দরকার নেই। সে ভেবে বেখেছে এবং তার মনে পড়েছে, ক্লাবকুর্ট শহরে একজন লোক আছে, যে তার বইগুলো ছাপে, তার কাছে এখনো কিছু পাওয়া আছে। সে তাকে চিঠি বেবে যদি তাকে সে অত্মমতি দেওয়া হয়। অত্মমতির জন্য সে পরমিনই চেষ্টা করবে। আজ জেরা চলবার সময় তার মনে হয়েছে যেন অবস্থাটা তেমন ভাল নয়। তাই সে ও প্রসঙ্গ ভোলেনি, তাহলে হয়তো সবটাই পণ্ড হতো।

যখন লোকটি কথা বলছিল, তখন বুড়ীটি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটিকে বুড়ীয়ে দেখছিল। যারা ধারে জিনিস কেনে সেই সব উদাসীন লোকদের ওপর অস্বাভাবিকতার ব্যাপার সবই তার জানা। তাদের দায়িত্বের কথা তারা ঘোড়ার ভিন্ন ভাবে, তারপর যখন লোকে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকে, তখন তারা এমন ভাব করে যেন আকাশ পাতাল লজ্জিত করছে।

“হায় দেবার কসতাই যখন ছিল না, তখন আপনার ওভারকোটের দরকারটা কেন পড়েছিল?” জিজ্ঞাসা করল কড়া স্বরে।

বন্দী লোকটি মাথা নেড়ে আনাল, সে বুড়ীর মনের কথা বুঝতে পারছে। বলল :

“বই লিখে আর ছাত্র পড়িয়ে আমি সব সময়ে রোজগার করতাম। তাই আমি ভেবেছিলাম, ঐভাবেই রোজগার হবে। আর ওভারকোটটা দরকার হবে ভেবেছিলাম, কারণ আমার ধারণা ছিল আমাকে বাইরে ঘোরাকেরা করতে হবে।”

তার এই কথাগুলোর মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল না, বোকা গেল শুধু, সে উত্তরটা দেওয়া দরকার মনে করে।

বুড়ীটি আবার তাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখল, খুব বিরক্ত; তবে তার মনে হল, আর তাকে প্রশ্ন করার দরকার নেই, তাই আর একটা কথাও না বলে সে ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

‘যার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিচার সভা মামলা করছে, তাকে আবার কে অর্থ সাহায্য করবে?’ এটো কথা বুড়ী বলল যেনে তার স্বামীকে সেই রাতে বিছানায় শুয়ে। গীর্জার লোকরা তার ব্যাপারে যে মনোভাব দেখাচ্ছে তাতেই সে নিশ্চিত, তবে তার দ্বাৰা যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে দামটা আদায় করবার, সে ব্যাপারে তার সংশয় ছিল।

“তার হয়তো এখন অন্য কামের কথা ভাবতে হচ্ছে”, বলল গল্পগিঁয়ে।

বুড়ী আর কোনো কথা বলল না।

পরের মাসগুলো কেটে গেল, ঐ বিলী ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটল না। কাজরারীর প্রথম দিকে শোনা গেল সিনোরিয়া ভাবছে পোনের ইচ্ছা। অতীতের বিরোধী লোকটাকে পাঠিয়ে দেবার কথা। আর সেই সময়ে ৭৫৫টো ক্রোড়ের কাছে একটা নতুন আমন্ত্রণ আসে, ধর্মীয় আদালতের বাড়ীতে যাবার জন্য।

কোনো বিশেষ সময়ের উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ফ্রাউ ৭৫৫টো একদিন

বিকলে গেল। সে অসময়ে উপস্থিত হয়েছিল। বন্দী তখন পণ্ডরের প্রকুরেটোর-এর অপেক্ষার ছিল। প্রকুরেটোরকে সিনোরিয়ার তরক থেকে তার বেপারা চরেছিল, বন্দীকে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারের ব্যবস্থা পাকা করিতে। বুড়ীর সঙ্গে সেই বড় কর্মচারীটি, যে নোনার লোকটির সাথে তার প্রথম কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছিল। সেই প্রবীণ লোকটি তাকে জানাল, বন্দী তার সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তবে তার ভেবে দেখা উচিত ঠিক এই সময়ে দেখা করাটা ঠিক হবে কিনা, কারণ এছাড়া বন্দীকে এমন একটা লাঞ্ছনার করতে হবে, যা তার কাছে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বুড়ী শুধু বলল, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখলেই হয়।

কর্মচারীটি চলে গেল তারপর বন্দীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। কথাবার্তা চলল সেই বড় কর্মচারীর উপস্থিতিতে।

নোনার লোকটি হঠাৎ করে এসেই একটু তেলেছে, কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই বুড়ী মুখ কামটা দিয়ে উঠল :

“এমন ভাব দেখান কেন বলুন তো, যেন আপনি বাটরে বেরোতে চান ?”

এক মুহূর্তের জন্ত মনে হল, সেই চোঁটখাট লোকটি একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। গত তিনমাস ধরে সে অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, আর এই বজি-বো-এর সঙ্গে শেষ কি কথা চরেছিল, তা তার ঠিক মনে নেই।

“আমার নামে কোনো অর্থ এসে পৌঁছায় নি”, বলল অবশেষে, “আমি দুবার ও ব্যাপারে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু কিছুই আসেনি। আমি ভেবে দেখলাম, তোমরা গুজারকোটটা করত নেবে কিনা।”

“আমি জানতাম তো, এই হবে”, বলল সুপার সঙ্গে। “ওদিকে ওটা মাপমত তৈরী, বেশীর ভাগ লোকেরই গারে খাট হবে।”

নোনার লোকটি ক্রীড়াভাবে তাকাল সেই বৃদ্ধার দিকে।

“সে কথা আমি ভাবিনি”, বলে তাকাল সীজার লোকটির দিকে।

“আমার ব্যবসায়ী সম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ এদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না ?”

“সেটা সম্ভব হবে না”, যে কর্মচারীটি তাকে নিয়ে এসেছিল সে বলল, সেই লম্বা চঞ্চা লোকটা। “ওসব হেয়ার বোকেনিগো দাবী করেছে। আপনি অনেক দিন তার পরচে কাটিয়েছেন।”

“সে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল”, নোনার লোকটি প্রতিবাদ করল রাস্তা-
ভাবে।

বুদ্ধ কর্মচারী হাত তুলল।

“এখন এসব কথাই সময় নয়, সত্যিই না। আমার মনে হয়, ওভারকোটটা
কেরত দিয়ে বেওয়া উচিত।”

“সেটা দিয়ে আমরা কী করব?” বুড়ীর সেট একরোখা প্রশ্ন।

রুদ্ধের মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বলল :

“একটা কথা শুধুন, সামান্য একটু মানবিক ব্যবহার আপনার পক্ষে
বেমানান হবে না। অভিব্যক্তি এই লোকটি এমন একটা বিতর্কের সঙ্গে জড়িত
যার মর্ম তার কাছে জীবন বা মৃত্যু হতে পারে। আপনি নিশ্চয় দাবী করেন
না যে এখন লোকটির পক্ষে আপনার ওভারকোট নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়।”

বুড়ী তার দিকে অনিশ্চিতভাবে তাকাল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে
কোথায় দাঁড়িয়ে। ভাবছিল, এখন চলে যাওয়াই ঠিক হবে কিনা, এমন সময়
তার পেছনে বন্দীকে নীচু গলায় বলতে শুনল :

“আমার মনে হয়, সেট দাবী করতে পারে।”

তারপর যখন সে বন্দীর দিকে ফিরে দাঁড়াল, তখন লোকটা আরো বলল :
“আপনাকে এসবই কমা করতে হবে। আপনার ক্ষতিতে কিছু ব্যয় আসে না,
এমন কথা কখনই ভাববেন না। আমি এব্যাপারে একটা দরখাস্ত করব।”

বুদ্ধ কর্মচারীটির এক ইশারায় লম্বা চওড়া লোকটি ঘর থেকে সরিয়ে
গেল। তারপর ফিরে এসে হাততটো ছড়িয়ে বলল : “ওভারকোটটা আদতে
এখানে জমাই দেওয়া হয়নি। সেই মোকেনিগো নিশ্চয় ওটা রেখে দিয়েছে।”

নোনার লোকটি স্পষ্টতই চমকে উঠল। তারপর দৃঢ় স্বরে বলল :

“এটা ঠিক নয়। আমি ওর নামে নালিশ করব।”

বুদ্ধ কর্মচারীটি মাথা নাড়ল।

“ছচার মিনিট পরেই যে আলোচনায় আপনাকে অংশ নিতে হবে, বরং সেই
ব্যাপারে ভাবুন। সামান্য-কয়েকটা স্কুডির জন্য এত কামেলা আমি আর
চালাতে দিতে পারি না।”

বুড়ীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। নোনার লোকটি বতকণ কথা বলছিল,
ততকণ সে চূপ করে ছিল, মুখ বুজে ঘরের এক কোণের দিকে তাকিয়ে ছিল।
কিন্তু এবার তার খৈয়ের সীমা ভেঙে পড়েছে।

“কয়েকটা ছুটি!” চিংকার করে উঠল। “ওটা একমাসের রোজদার! আপনি অন্যরাসে বলে দিতে পারেন। তাতে কোনো ক্ষতি হবে না!”

ঠিক এই সময়ে একজন বিশাল লম্বা মংক দরজার এসে দাঁড়াল।

“গ্রন্থরেটর এসেছেন”, বলল অবাধ হয়ে বুড়ীকে চোঁচাতে বেধে।

লম্বা চওড়া লোকটা নোলার লোকটির হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। কদী তার অগ্রশব্দ কীমের ওপর দিয়ে বতকণ না তাকে চৌকাঠ পার করে নিয়ে গেল, ততক্ষণ মহিলাটির বিকে তাকিয়ে দেখছিল। তার লম্বা মুখটা বেশ ক্যাকাশে।

বুড়ী ছুট মনে সেই বাড়ীর পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কি ভাববে তাই সে বুঝতে পারছিল না। বাউহোক, লোকটা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

এক সপ্তাহ পরে সেই লম্বা চওড়া লোকটা যেদিন গুভারকোটটা নিয়ে এল তার আগে বুড়ী আর সেলাই কারখানার যারিনি। দরজার কান পেতে সেই কর্মচারীকে বলতে শুনল : “লোকটা সন্তিসভাই সেই শেষ কটা দিনও এই গুভারকোটের ব্যাপারে চেষ্টা করেছে। জেরা এবং বিতর্কের মাঝে দুবার সে দাবী পেশ করেছে, সেখানে শহরের সব আমলারা উপস্থিত ছিল, তাছাড়া বহুবার সে চেষ্টা করেছে এই ব্যাপারে গোপের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবার। তার চেষ্টা সফল হয়েছে। সেই হোকেনিগো গুভারকোটটা দিতে বাধ্য হয়েছে। তবে একটা কথা, এই গুভারকোটটা এখন তার খুবই উপকারে লাগতে পারত, কারণ তাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই সপ্তাহের মধ্যেই তাকে রোমে যেতে হবে।”

কথাটা ঠিক। তখন জাহাজারীর শেষ।



সাজানোর এবং তাঁর সৈনিক

১

সীতার

আট মাসে শুধু থেকেই সেই ডিক্টেটর জানত, তার ডিক্টেটরীর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

গ্রাম থেকে আসা নতুন লোকের কাছে শহরটা তরতো অসাধারণ হুম্মর মনে হতে পারতো। শহরটা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে; লোকজনের বাসস্থানগুলি মনোরম অধিবাসীদের চাপে ফেটে পড়বার মত; বিশাল বিশাল সরকারী প্রাসাদগুলো তৈরী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; শহরটা পরিকল্পনার মূখর; অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ; ক্রীতদাস সস্তা।

সরকার দ্বারী বলে মনে হয়। ডিক্টেটরকে সবে তাঁর বৃত্তাকাল অবধি ডিক্টেটর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তখন তিনি 'তাঁর সবচেয়ে বড় প্রকল্পের জন্ত' তৈরী হচ্ছেন, প্রাচ্য দেশ জয় করা, বহুকাল যাবৎ আকাঙ্ক্ষিত পারম্প্র অভিযান। আলেক্সান্ডারের মত প্রকৃত দ্বিতীয় অভিযান।

সীতার জানতেন, তিনি সেই মাসটা পার করতে পারবেন না। তিনি তাঁর কন্মতার দীর্ঘ। তাঁর সামনে অতএব পতন।

১৩ই মার্চের বিশাল সিনেট-অধিবেশনে ডিক্টেটর তাঁর বক্তৃতায় 'পারম্প্র সরকারের আসন্ন শক্তাঙ্গক মনোভাবের' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন এবং তিনি যে মিশরের রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়াতে সৈন্ত সমাবেশ ঘটিয়েছেন সে খবর প্রকাশ করেন, তার ফলে সিনেটের এক লক্ষণীয়, রীতিমত উত্থানীয় নিম্মাণ মনোভাব প্রকাশ পায়। বক্তৃতা চলাকালে ডিক্টেটর কি পরিমাণ অর্থ স্পেন-এর ব্যাঙ্কে বেনামীতে জমা দিয়েছেন তার এক অতুল তালিকা সিনেটরদের মধ্যে ছুরছিল: 'ডিক্টেটর তাঁর ব্যক্তিগত বনমৌলত (১১ কোটি) বিদেশে পাচার করে দিয়েছেন!' তাহলে কী তিনি তাঁর বৃত্তে আত্ম রাখতে পারছেন না? কিবা

জার উদ্দেশ্যে আরো পারত বেশের বিক্রেতা হুজ করা নয়, উদ্দেশ্যে রোনের বিক্রেতা হুজ ?

ব্যবসায়ী হুজের বরং সিনেট সর্বসম্মতিক্রমে হুজ করল।

প্রাচ্যদেশ প্রদেশে ব্যবসায়ী চক্রান্তের কেন্দ্র ক্রেমোপেজার প্রাচ্যে সেনা বিকাশের উচ্চ পথে অধিষ্ঠিত লোকেরা হিলিত হয়েছে। হিশরের রানীই পারত-হুজের প্রকৃত প্রেরণা। ক্রটাস আর ক্যাসিয়ার এবং অন্যান্য হুজক অফিসাররা সিনেটে ক্রেমোপেজার হুজনীতির সর্বাঙ্গীণ সাক্ষ্যে জন্য তাকে অভিযুক্ত করল। সেই অন্তঃ তালিকা বোরানোর হুজটা তার, সেকন্য ব্যবসায় বিস্ময় প্রকাশ করা হল, হাস্যচাসি চল। হুজ করা অর্থ শহরে সংগ্রহ করতে গেলে ডিক্টেটর অধিক হবেন...

সিনেটের ব্যবসায়ী ব্যাপারে উদাসীন তৎপরতা সীজারের হুজি এডারনি, তাছাড়াও তিনি শহরে সত্যিসত্যিই একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর অবস্থার কথা জানবার সুযোগ পেলেন। ব্যবসায়ী সংঘে দেয়ালে বোলানো বস্ত্র একটা ব্যাপার সামনে দাঁড়িয়ে অর্থনীতিবিদদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন পারত এবং ভারতবর্ষের দিকে মৈন্য পাঠাবার পরিকল্পনার কথা। সেই লোকেরা মাথা নেড়ে জানাল তারা হুজতে পেরেছে, কিন্তু শুরু করল ফরাসীদের কথা বলতে, বেশ কয়েক বছর আগেই সেই দেশ জয় করা হয়ে গেছে, কিন্তু সেখানে আবার রক্তাক্ত বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। 'নতুন ব্যবস্থা' কাজ করছে না। একটা প্রস্তাব এল : এই নতুন হুজ শরৎকালে শুরু করা যায় না? সীজার উত্তর দিলেন না, সোজা বেরিয়ে গেলেন। সববেত লোকেরা রোমীয় পদ্ধতিতে হাত তুলে অভিযান জানাল। কে একজন বিড়বিড় করে বলল, "একটুও সাহস আর মেই, লোকটা—।"

ওরা কি চঠাং আর হুজ চায় না ?

থবর নিয়ে জানা গেল অত্যন্ত এক সভা। অস্ত্র তৈরীর কারখানাগুলিতে পাগলের মত হুজের প্রস্তুতি চলছে, তাদের শেয়ারের দ্বার হঠাৎ বেড়ে গেছে, ক্রীতদাসদের দায়ও বাড়তির দিকে...

এর অর্থ কী? ওরা ডিক্টেটরের প্রস্তাবমত হুজ চায় অথচ সেকন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে অনিচ্ছুক ?

সন্ধ্যার দিকে সীজার জানতে পারলেন এসবের অর্থ—'ওরা হুজ চায়, তবে তাঁকে বাঁচিয়ে।'।

তিনি আদেশ দিলেন, পাঁচজন ব্যাকারকে গ্রেফতার করতে, অবশ্য তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন, প্রায় সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেললেন, তাই দেখে তাঁর এক সেনাপতি অবাধ হল, সে তাঁকে রক্তাক্ত হৃদয়ের মাঝখানে সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে দেখেছে। ক্রটাস এলে তিনি কিছুটা শান্ত হলেন, তাকে তিনি খুব স্নেহ করেন। তবুও কিন্তু তিনি একটা ফাইল খুলে দেখবার মত বখেটে সাহস পেলেন না। ফাইলটা তাঁর এক অচ্যুত শহর থেকে পাঠিয়েছে। ঐ ফাইলে আছে বড়বল্লকারীদের নাম, তার মধ্যে ক্রটাসের নামও আছে। তারা তাঁকে হত্যা করবার চক্রান্ত করেছে। ঐ যেটা ফাইলে (“ওটা এত বেশী যেটা, ডরকর যেটা”) বিশ্বস্ত লোকেদের নামও থাকতে পারে, সেট ডর ডিক্টেটরকে বাধা দিল ওটা খুলে দেখতে। সীজার যখন ওটা না খুলেই তাঁর একজন সেক্রেটারীকে ফেরত দিলেন—পরে এক সময়ে দেখবেন বলে, তখন ক্রটাসের এক রাস জল দরকার হল।

ক্রটাস যখন ফ্যাকাশে মুখে বিচলিতভাবে ক্রেয়োপেড্রার গালাদে এলে জানাল যে বড়বল্ল ব্যাপারে একটা ফাইল আছে, তখন সেখানে যেন আতঙ্কের এক বিস্ফোরণ ঘটল। যে কোনো মুহূর্তে সীজার সেটা পড়তে পারেন। অনেক চেষ্টায় ক্রেয়োপেড্রা উপস্থিত সকলকে শান্ত করল, তাদের সৈনিক মর্দ্যহার ঘোঁরাই দিয়ে। তারপর নিজেরই আদেশ দিল আত্মগোপন করতে।

ইতিমধ্যে পুলিশ-প্রধান এসেছে সীজারের কাছে। এই বছরে এটি তৃতীয় ব্যক্তি, আর এই বছরের বয়স হবে দু’মাস। তার আগের তখন বড়বল্লকারীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার বরখাস্ত হয়েছে। এই পুলিশ-প্রধান ডিক্টেটরের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিল—যদিও ব্যাকারদের গ্রেফতার করার ফলে উদ্বেজনার কষ্ট হয়েছে এবং সেজন্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাস্তব চলেছে...। পারস অভিযান যে ক্ষীণ শুরু হবে, এ ব্যাপারে এট প্রধানকে নিশ্চিত মনে হল, তার মতে তখন বিরোধী পক্ষ চূর্ণ করে যাবে। যখন লোকটা নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা বুঝিয়ে বলছে, বেশব ব্যবহার প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে, সেসব কথা বলছে, তখন সীজার লোকটার মধ্য দিয়ে দিবা দৃষ্টির মত দেখতে পেলেন, কিতাবে তিনি মরবেন; কারণ তিনি মরবেন।

‘তিনি বলবেন তাঁকে পম্পেয়ন-এর পট্টিকোতে নিয়ে যেতে, সেখানে রাখবেন, প্রার্থীদের ব্যবস্থা করবেন, হাঙ্গিরে যাবেন, সিনেটরদের একজনকে বা অন্যজনকে এক হলক দেখবেন, অভিযান করবেন চেয়ারে বসবেন।

তখন সেই বড়জকারীরা—সীকারের দ্ব্যর্থকভাবে তাদের মূখ নেই, যেখানে মূখভঙ্গী থাকবার কথা সেখানে শুধু সাধা হাস—তার দিকে এগিয়ে আসবে কোনো। একটা অজুহাত দেখিয়ে। কেউ তাঁকে একটা কিছু পড়তে দেবে, তিনি দেখিকে হাত বাড়াবেন, ওরা তাঁর ওপর কানিয়ে পড়বে, ‘তিনি হারা যাবেন’।

না, প্রাচ্যদেশ অভিযান তাঁকে আর করতে হবে না। তাঁর বাবতীর কার্যকলাপের মধ্যে খেঁচা সবচেয়ে বড়, সেটা আর খটবে না। ‘একটা উপায় ছিল, জীবিত অবস্থায় একটা কাচাজে ওঠা’, সেই কাচাজ পারত তাঁকে আলেক্সান্দ্রিয়াতে তাঁর সৈন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে, একটি মাত্র জায়গায়, যেখানে তিনি হয়তো নিরাপদ।

অনেক রাতে তখন গ্রহরীরা কয়েকজন লোককে ডিক্টেটরের প্রাসাদে যেতে দেখে, তারা তখনো ভাবে, ওরা সব সেনানায়ক, পারস্ত অভিযান প্রসঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু তারা আসলে ডাক্তার, ডিক্টেটরের মূখের ওষুধ দরকার।

পরদিন, ১৮ই মার্চ কেটে যায় বিস্ত্রান্তি আর নিষ্কাশন মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে। সকালে ঘোড়ার চড়ে বেড়াতে যাবার সময় ঘোড়ার চড়া শেখার ফুলে সীকারের মাথার একটা খুব ভাল বৃদ্ধি এল। সিনেট এবং শহর তাঁর বিক্রেতা, তাতে কী? ‘তিনি জনগণের আস্থা লাভের চেষ্টা করবেন!’

ছিলেন না তিনি একসময়ে জনগণের মহান নেতা, পণ্ডত্বের উজ্জল আশা? তখন তো এক বিশাল পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তার কলে সিনেট আড়ালে সরতে বসেছিল, চাবের জমি বন্টন, পরীবদের মাথা পৌঁছবার ঠাই।

ডিক্টেটরী? আর ডিক্টেটরী নয়! মহান সীকার অবসর নেবেন, সাধারণ জীবনে ফিরে যাবেন, হয়তো স্পেন-এ চলে যাবেন...

একজন ক্রান্ত লোক ঘোড়ার চেপেছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘোড়ার চেপে চকর দিচ্ছিল, তারপর তার দেহভক্তি (বিশেষ এক চিন্তার—জনগণের চিন্তার) দৃঢ় হল, লাগামে টান দিল, ঘোড়াকে নিজের আয়ত্রে আনল, সেটাকে দুটিয়ে তার বাহ বার করে দিল; একজন সন্তোষ, নতুন সাহস সেই ফুল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

যারা সেই বিশাল খেলার বড় তাদের মধ্যে অনেকেই আজ সকালে নিজেকে সীকারের বড় নিশ্চিত বোধ করছে না।... বড়জকারীরা প্রেক্ষার

হবার আশঙ্কার রয়েছে। কঠিন তার সব বাগানে পাহারা বসিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় ঘোড়া প্রস্তুত। কিছু বাড়ীতে কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। টিবার-এর ধারে ক্রেয়োপেত্রা তার প্রাণাবে মৃত্যুবিশেষে ভক্ত প্রস্তুত হচ্ছে। এতকণে সীজার নিশ্চয় সেই ফাইল পড়ে ফেলছে। সে বস নিয়ে প্রসাধন সারল, কীতদাসদের হুঁকি ছিল, তাহের মধ্যে উপহার ভাগ করে ছিল। জরায়র নিশ্চয় একুনি আসবে।

গতকাল বিরোধীপক্ষ আঘাত করেছে। আজ অবজই সরকারের প্রতিবাদ আসবে।

ডিক্টেটরের প্রাতঃকালীন সর্ষনার সময়ে জানা যাবে প্রতিবাদের প্রকৃতি।

প্রচুর সিনেটরের উপস্থিতিতে সীজার বললেন তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা। তিনি ভোটের কথা ঘোষণা করবেন, অবসর নেবেন। তাঁর আত্মবিশ্বাসী : 'মুক্তির বিরোধিতা!' রোমের নাগরিকরা ইটালী অধিকার করবে, পারস্ত নয়। কারণ রোমের নাগরিক, ছুনিয়ার শালক, কিভাবে বেঁচে আছে সীজার তা ব্যাখ্যা করলেন।

পাথরের মত কঠিন মুখগুলো শুভল রোমের সাধারণ নাগরিকদের ছুরবছার ভয়ঙ্কর অবহার কথা। ডিক্টেটর মৃদোশ খুলে ফেলছেন; তিনি জনতাকে উত্তেজিত করবেন। আধঘণ্টা পরে সমস্ত শহর একথা জানবে। শহর এক সিনেট, ব্যাঙ্কার এবং আমলাদের মনোকার শক্ততা উদ্ভাও হবে, সবাই একটা ব্যাপারে একমত হবে : সীজারকে শেষ কর !

বক্তৃতা শেষ হবার আগেই সীজার বক্তৃতে পেরেছেন, একটা ফুল করা হয়ে গেছে। তাঁর এতটা খোলাখুলি না হওয়াই উচিত ছিল। হঠাৎ তাঁর বক্তৃতার বিষয় পাঠে তাঁর চিরকালের পরীক্ষিত জাহুর আশ্রয় নিলেন। তাঁর বক্তৃতির শক্তি হবার কোনো কারণ নেই। তাঁদের কু-সম্পত্তি সব নিরাপদ। চাবীরা হাতে জমি পার তাঁর চেঁচা করা হবে, তবে সে কাজ করবে সরকার, সরকারী সম্পত্তির সাহায্যে। ক্রীতকাল হুন্দর হয়ে উঠবে, তারা তাঁর বাজ্যাতে অস্তিত্ব পাবে।

ওহা নিমন্ত্রণের ভক্ত বক্তব্য জানিয়ে চলে যাওয়ার পর সীজার পুলিশ-প্রধানের বরখাস্ত এবং প্রেক্ষতার ব্যবস্থা করলেন, লোকটি আগের দিন সন্ধ্যাভেই বন্দী ব্যাঙ্কারদের আবার মুক্তি দিয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর

সেক্রেটারীকে পাঠালেন, গণতান্ত্রিক মহলের প্রতিক্রিয়া বাজিয়ে দেখবার জন্য। এখন সবকিছু নির্ভর করছে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার ওপর।

গণতান্ত্রিক মহল হচ্ছে বহুকাল আগে বাতিল করে দেওয়া প্রমিত-সম্মেলন রাজনীতিবিদরা, তারা সাধারণতন্ত্রের স্বর্ণ যুগে ভোটের সময় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিত। একদা শক্তিশালী এই ব্যক্তিকে সীকারের ডিক্টেটরী ডেডে দিয়েছিল আর সেই সম্মেলন কিছু সভা করেকটা প্রজাসমিতি গড়েছিল, তৎকালীন রাস্তার হল, সেগুলোও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন সেই সেক্রেটারী টিউস রাকস প্রমিত নেতাদের বুকে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রতিক্রিয়া বাজিয়ে দেখবার জন্য।

সে তৎকালীন বাড়ী রঙ করার প্রমিতদের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলল, তারপর সেকালের একজন ভোটের হটপ-এর সঙ্গে, লোকটা এখন একটা রেস্তোরাঁর মালিক। দুজনকেই অত্যন্ত সাবধানী মনে হল, রাজনীতি প্রসঙ্গে কথা বলতে পররাষ্ট্রী। তারা সেই বড় কার্পোর কথা তুলল, তৎকালীন রাজনীতিবিদদের নেতা ছিল লোকটা, তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশী, 'কারণ সে বন্ধী'।

উচিতমধ্যে সীকারের কাছে মন্ত অতিথি এসেছে : ক্রেয়োপেজা। রানী সেই পড়া আর সহ করতে পারেনি। তাকে জানতেই হবে, তার অবস্থাটা কি। বৃত্তার জন্য সাজ করেছে, মিশরের সমস্ত চাকুরী প্রকাশ পেয়েছে, তিন মহাদেশে খাত তার সৌন্দর্যকে কাছে লাগাতে। ডিক্টেটরের তাড়া আছে বলে মনে হল না। তাঁর ব্যবহার পত বহুরঙলোকে সব সময় বেমন ছিল, পছন্দসই বিনয়, সব সময় পরামর্শ দিতে প্রস্তুত। মাঝে মধ্যেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তিনি তৎকালীন তার প্রেমাম্পদ হতে পারেন, যদি সে তা চায়, রমণীর সৌন্দর্যের অপরিণীত বিদগ্ধ ব্যক্তি, তিনি তাই। তবে রাজনীতি প্রসঙ্গে একটিও কথা নয়। দুজনে আট্টিউন-এ বলে সোনালী বাছলোকে খাওয়ারালো, আবহাওয়া নিয়ে কথা বলল। তিনি ওকে ঐক্যকালে তাঁর বাজাতে নিবরণ জানালেন...

ক্রেয়োপেজা শান্তি পেল না। ভাবল সীকার তখনো সংহার মূর্তি ধারণের ব্যবস্তার প্রস্তুতি পূর্ব শেষ করে উঠতে পারেনি, তাই বোধহয় প্রকৃত ঘটনা। ক্রেয়োপেজা পতীর মুখে চলে গেল। সীকার তাকে সীতান অবধি পৌছে দিচ্ছেন, তারপর গেলেন সেইসব বস্তুরে, বেখানে আইনবিদ আর সেক্রেটারীরা,

পাশের বস কাছ করছে নতুন জোড়ের আইবোর থলকা তৈরী করবার জন্য। থলকা গোপন রাখতে হবে। প্রাণাই ছেড়ে বাইরে বাবার অস্থব্ধি কারো নেই। 'এই সংবিধান রোমে এ বাবু যা হয়েছে সেই সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদার হবে।'

সবুজই এখন অবস্থা নির্ভর করছে জনসাধারণের ওপর...

রাকস যে একতরফ ধরে বাইরে রয়েছে—কি এমন কথাবার্তা বলবার থাকতে পারে, ডিক্টেটর তাদের যে অকৃতপূর্ব হুযোগ দিয়েছেন, জমিকরা সেটা হুহাতে লুটে নেবে, এটাই তো ঠিক—, সীজার ঠিক করলেন, কুকুরের ঘোঁড় বেধতে বাবেন। নিজে সাধারণ লোকদের সম্পর্কে আসবার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন, আর কুকুরের ঘোড়ের মাঠেই জনতাকে পাওয়া যাবে। ধর্ষকদের আসন তখনো সম্পূর্ণ ভরে ওঠেনি। সীজার সেই বড় বন্ধে না গিয়ে আরো ওপরে সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে বসলেন। তাঁকে চিনে ফেলতে পারে সে ভয় তাঁর বলতে গেলে নেই, লোকেরা তাঁকে সবলময়ে বহুদূর থেকে বেখেচে।

সীজার কিছু সময় বেখলেন, তারপর তিনিও একটা বিশেষ কুকুরের ওপর বাজি ধরলেন। তাঁর পাশে একটা লোক বসে, তিনি তাকে বললেন, কেন তিনি এই বিশেষ কুকুরটাকে বেছে নিয়েছেন। লোকটি মাথা নাড়ল। সামনের দিকে একটা সারি ওপাশে সামান্য বড়াট হচ্ছে। কিছু লোক মকে হল ভুল জায়গায় বসে পড়েছে, নতুন যারা এসেছে তারা তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিল। সীজার চেঁচা করলেন তাঁর পাশের লোকদের সঙ্গে গল্প করবার এমনকি রাজনীতি প্রসঙ্গেও। তারা এক কথায় উত্তর সারল, আর তখন তিনি বুঝতে পারলেন, ওরা জানে, তিনি কে : তিনি বলে আছেন তাঁর চর্যবেশী পুলিশদের মধ্যে।

বিরক্ত হয়ে তিনি উঠে পড়লেন, তারপর চলে গেলেন। যে কুকুরটার ওপর তিনি বাজি ধরেছিলেন, সেটি অবস্থা জিতেছিল...

হাটের সামনে তাঁর বেথা হল সেই সেক্রেটারীর পাশে, সে তাঁকে বুঝছে। সে হুখবর আনতে পারেনি। কেউ চুক্তি করতে চায় না। সর্বত্র হয় ভয় নরমতা স্থা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেঘেরটা। যে লোকটিকে সবাই বিশ্বাস করে সে কার্পো, সেই রাজবিল্লী। সীজার হতাশ ভাবে জনলেন। তিনি তাঁর সীতানে চাপলেন, বললেন তাঁকে মাঝারটিন কারাগারে নিয়ে যেতে। তিনি কার্পোর সঙ্গে কথা বললেন।

এখানে কাপৌকে খুঁজে হন। সেকালের গ্রহর গ্রন্থিক বই এই খাঁচাগুলোর মধ্যে আছে, তখন তখন তারা এখানে পড়ে রয়েছে। কিন্তু অনেককণ এদিক ওদিক করার পর সেই রাজমিস্ত্রী কাপৌকে একটা লম্বা হুড়িতে বেঁধে একটা কোকর থেকে বার করে আনা হন। এবার ডিট্টের লোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারেন, এই লোকটিকে রোমের জনগণ বিচাল করে।

হুজনে সুখোমুখি বলে পরস্পরকে দেখল। কাপৌর বয়স হয়েছে, হয়তো সীজারের চেয়ে বয়সে বড় নয়, তবে তাকে অবশ্যই আশি বছরের বলে মনে হয়। বেশ বরফ, বেশ খারাপ আঁহা, তবে ভেঙে পড়েনি। কোনো রকম ভণিতা না করে সীজার তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন, আবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা, গণভোট ঘোষণা, নিজে অবসর নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে কিরে বাবার কথা, ইত্যাদি, প্রভৃতি।

বুড় লোকটি চুপ করে থাকল। সে ই্যা বলল না, সে না বলল না, সে চুপ করে রইল। সে কঠিন হুড়িতে সীজারকে দেখল কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। সীজার যখন চলে এলেন তখন তাকে সেই লম্বা হুড়ি লম্বা তার কোকরের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। গণতন্ত্রের স্বপ্ন ভেঙে গেল। স্টাই হল—তাঁর পতনের সময় ওরা কেউই এগিয়ে আসবে না। ওরা তাঁকে খুব ভাল ভাবে চেনে।

ডিট্টের তাঁর প্রাসাধে কিরনে তিনি কে, সেকথা গ্রহরীদের বুঝিয়ে বলতে তাঁর সেক্রেটারীরা খুব স্বামেলার পড়েছিল। গ্রহরীরা নতুন। পুলিশের নতুন প্রধান রোমান গ্রহরীদের সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের জায়গায় একদল নিগ্রোকে প্রাসাধে এনে হাজির করেছে। নিগ্রোরা অনেক নিরাপদ, ওরা ল্যাটিন নামে না কাজেই সহজে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না এবং শহরের হালচালে এদের ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া পড়বে না। এবার সীজার জানলেন, শহরের হালচাল কেমন...

প্রাসাধে সেই রাজটা কাটল অবতির মধ্য দিয়ে। সীজার বছবার বিছানা ছেড়ে উঠে বিশাল প্রাসাধের মধ্যে পাগড়ারি করলেন। নিগ্রোরা মধ্য থেকে গান গাইছে। কেউ তাঁকে খেয়াল করছে না, কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। তিনি ওদের একটা করণ গান শুনলেন তারপর গেলেন আত্মাফল, তাঁর প্রিয় বোকাটাকে দেখতে। সেই বোকাটা বাই হোক তাঁকে চিনতে পারল—। চিরকালের রোম অবতির মধ্য দিয়ে আসছে। রাজের আত্মা-

জুজোর ভোরণের সামনে বিপরীত দিকেরা। তখনো ঝড়িয়ে তিন খট্টা ঘুরোবার আবার আর প্রাচ্যদেশ অভিযানের বিবরণ দিয়ে নৈমিত্তিক বেলন পোটার কুনিয়ে ছিল, সেইসব আঘাতের পোটার পড়ছিল, সেই অভিযান আর ঘটবে না। জ্যোতিষ ভোরের বাগানের গভীর রাতের প্রহরীরা সব উঠাও। প্রাসাদগুলোর ভেতর থেকে বাতালের স্বর ভেসে আসছে। শহরের হকিমের এক ভোরণের কথা দিয়ে ছোট এককল বোতলগুলোর বেরিয়ে গেল : সম্পূর্ণ অবশেষে ঢাকা রানী ক্রোশোপেজ। রাজধানী ত্যাগ করল...। রাজি হুটোর সময় সীজারের কি মনে হল, বিছানা ছেড়ে উঠে রাতের পোশাকেই প্রাসাদের যে অংশে আইনবিররা তখনো নতুন সংবিধান তৈরীর কাজে ব্যস্ত সেখানে গেলেন। তাদের জুরোতে পাঠালেন।

সকালের দিকে সীজারকে জানানো হল, তাঁর সেক্রেটারী রাকস সেই রাত্রে খুন হয়েছে। মনে হয় প্রতিক নেতাদের সঙ্গে তার আলোচনার কথা কাল হয়ে গেছে আর অন্ধকারের ভেতর থেকে কঠোর হাতগুলো তৎপর হয়ে উঠেছে। কাদের হাত ? রাকস-এর কাছে বড়বরকারীঘরের নামের যে ডালিকা ছিল, সেটা উঠাও।

যে প্রাসাদে খুন হয়েছে। অর্থাৎ ডিক্টেটরের সমর্থকদের পক্ষে এই প্রাসাদ আর নিরাপদ নয়। ডিক্টেটরের নিজের পক্ষে ?

সীজার অনেকক্ষণ ঝড়িয়ে রইলেন ক্যাম্প বাটটার সামনে, তার ওপর বৃত্ত সেক্রেটারীকে শোরানো, তাঁর শেষ বিশ্বস্ত লোক, বিশ্বস্ততার দ্বন্দ্বিতা ছিলেবে হিতে হয়েছে তার প্রাণ।

ঘরটার থেকে বেরোবার সময় এক বাতাল প্রহরীর সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগল, লোকটা হাপ চাটল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাবার সময় তিনি শক্তিতভাবে চারদিক দেখলেন।

আট্টিউন বেন অসহায় ভাবে পড়ে আছে—ডিক্টেটরের প্রাণত্যাগী সমর্থনার কেউ আসেনি।

আট্টিউন-এ দেখা হল আন্ডোনিউস-এর ঘরের সঙ্গে, কনকল আর তার বিশ্বস্ত সমর্থক খবর পাঠিয়েছে, তিনি বেন আজ কোনো ক্রমেই সিনেটে না যান। তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নাকি বিপরীত। সীজার আন্ডোনিউসকে বলতে বললেন, তিনি সিনেটে যাবেন না।—তার বদলে তিনি তাঁকে ক্রোশোপেজার বাড়ীতে নিয়ে যেতে বললেন, তাঁর প্রাসাদের সামনের প্রাচ্যদিক

অহরেককারীদের লগা সারির পাশ দিয়ে। ক্রয়োপেজা হয়তো তাঁর সৈন্ত লম্বাক্ষেপের পরচ বোঁগাবে? তাহলে তাঁর আর দিটিকেও হরকার মেই, কনসপেক্ত না।

ক্রয়োপেজা বাড়ী মেই। বাড়ী বহু। মনে হল বেশ কিছুকালের জন্য বাইরে গেছে...

আবার প্রাসাদে। লক্ষীর বিবর, ভোরণ খোলা। জানা পেল, প্রহরীদের সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অধিবর বীচু হয়ে তাঁর সীতান থেকে মিছের বাড়ীর দিকে দেখলেন, সেখানে চোকবার সাংস আর নেই তাঁর।

আন্ডোনিউস-এর কাছ থেকে একজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তিনি করতে পারলেন। কিন্তু কোনো দেহরক্ষীকেই আর বিশ্বাস নেই। বরং দেহরক্ষী ছাড়াই যাবেন, তাগলে অন্তত তাকে ভর পেতে হবে না। কোথায় যাবেন তিনি?

তিনি আবেশ হলেন। তিনি সিনেটে বাজেন।

সীতানে হলান দিয়ে বললেন। তাইমে বীরে কোনোদিকে তাকালেন না। পল্লেউস-এর পোর্টিকোতে নিয়ে যেতে বললেন। নারলেন। প্রাণীদের ব্যবস্থা করলেন। হন্ধিরে গেলেন। সিনেটরদের একজন বা অলকনকে খোঁজ করে এক কলক বেধে তাকে অভিবাধন জানালেন। তিনি তাঁর চেয়ারে বললেন। কিছু অজুঠান সারা হল। এবার বড়বরকারীরা তাঁর দিকে এগিয়ে এল, কি একটা অজুহাত তাহের। হুঁদিন আগে তাঁর অগ্নে দেখা সেই কাঁধের ওপর সাঁদা হাস নয়; এদের সকলের মুখ আছে, তাঁর প্রিয়তম বড়ুদের মুখ। কে একজন এগিয়ে দিল একটা কিছু পড়বার জন্ত, তিনি সেদিকে হাত বাড়ালেন। ওরা তাঁর ওপর কাঁপিয়ে পড়ল।

২

সীতারের সৈনিক

সূর্য ওঠার আগে একটা গরুর গাড়ী বলজের সবুজ কাম্পানার মধ্য দিয়ে রোদের দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ীতে আছে বাহার বছর বয়সের এক চাবী এবং এককালে সীতারের একজন প্রাণী সর্বক টেরেনটিউস কাম্পানার, তার পরিবার এবং তাহের লম্বাক্ষেপের বখানবখ। ওদের সকলের মুখে চিত্তার

ছাপ। চাঁদের ফেনার দ্বারে তাবের ছোঁটি বাহার খেঁক তাবের উৎখাত করা হয়েছে। একমাত্র আঠেরো বছরের লুকিলিয়া সেই বিশাল উম্মাশীন নহর বেধে বসা পাচ্ছে। তার ডাবী বাবী লেখানে থাকে। নহরের দিকে এসোতে এসোতে তারা লক্ষ্য করল, বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ঢেকপোটে-গুলোতে কড়াকড়ি অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায়ই সেনাবিভাগের লোকেরা তাবের দাঁড় করাচ্ছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, সামনে বিশাল এনিরা অভিযানের আয়োজন। সেই প্রবীণ সৈনিক তাকে একসময়ে আশা দেওয়ার কথা ভেবে সেনাদলে নাম লেখাবার অকিস ঘরগুলোর ধৌল করল, অত তোরে সেগুলো কীকা; সে প্রাণ কিরে পেল। সীজার নতুন বিজয় অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছেন। টেরেনটিউল কাপ্যার-এর পক্ষে ভালই হল। সেদিন ১৩ই মার্চ, খ্রিঃ পূঃ ৪৪।

সকাল ন'টা নাগাদ পক্ষর গাড়ীটা পম্পেউল-এর পোর্টিকোর ভেতর দিয়ে ঢুকল। অনেক লোক এখানে অপেক্ষা করছে। সীজার আসবেন আর সিনেটররা আসবে, যন্মিরে একটা বৈঠক বসবে, সেই বৈঠকে সিনেট 'ডিক্টেটরের এক ভরসী বিজ্ঞপ্তি' গুনবে, এইরকম কথা আছে। সর্বত্র হুন্ডের কথা, কাপ্যার কিন্তু অবাক হল, সেনাবাহিনীর লোকেরা সবাইকে সরে যেতে বলছে বেধে। সৈনিকরা উপস্থিত হলে প্রত্যেকটা বৈঠক নষ্ট হয়। সেই প্রবীণ তার গাড়ী ওর মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেই ব্যস্ত। অর্ধেক পথ পার হয়ে সে তার গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে পেছন দিয়ে চিৎকার করল, "সীজারের জয় হোক!" যেখে অবাক হল, কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না।

একটু অব্যস্তির সঙ্গে সে তার পরিবারকে নহরতলির এক সস্তা হোটেলে এনে ভুলল। তারপর বের হল তার ডাবী জামাই-এর ধৌলে। সে সীজারের সেক্রেটারী টিউল রাকুর। লুকিলিয়া সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, সে নিল না। সেই ছেলেটার সাপে তাকে প্রথমে 'একটা করলালা করহে হবে'।

বুঝতে পারল, সীজারের প্রাসাদে সাধারণ ভাবে ঢোকা রীতিমত কঠিন। তলানি, বিশেষ করে অস্ত্র ব্যাপারে, বেশ কড়া। হাওয়া গরম।

ভেতরে গিয়ে জানতে পারল, ডিক্টেটরের দুশোরও বেশী সেক্রেটারী আছে। রাকুরের নাম কেউ জানে না।

প্রকৃত পক্ষে গত তিন বছরের মধ্যে রাকুর প্রাসাদের এই লাইব্রেরী মহলে তার বাজিকের দেখা পারনি। সে সীজারের সাহিত্য বিকরক সেক্রেটারী এবং

তার সঙ্গে ব্যাকরণ ছির কাজ করেছে। সেই কাজে আর হাত পড়েনি, এমন কাজের জন্ত ডিক্টেটরের আর সময় নেই। সেই প্রবীণ দৈনিক বখন অতি কষ্টে লাইব্রেরীতে ঢুকল তখন তাকে দেখে রাকস আনন্দে আত্মহারা। কী, লুকিলিয়া এই রোমে? হ্যাঁ, সে এখানে, কিন্তু সেজন্য খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। পরিবারটিকে পথে বলিয়ে বেতড়া হয়েছে। সেজন্য লুকিলিয়াই সবচেয়ে বেশী দারী। সে অন্যরাসে জোতবারের কথা একটু ভাবতে পারত, লোকটা চানড়া কারখানার মালিক... বিশেষ করে রাকস বখন আর একবারও দেখা দেয়নি। ছেলেরা খুব চোটা করল নিজের অবস্থা বুঝিয়ে বলবার। সে দুটি পারানি। ওদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্ত সে সব করবে। সে অফিস থেকে আগাম নেবে। টেরেনটিউল কাপ্যার-এর জন্য সে তার সব জামানোমা লোকেদের বলবে। প্রবীণ দৈনিক, সে কেন সেরাপতি হবে না, বিশেষ করে নামনে বক হুত!

করিতোরে পায়ের শব্দ আর তরবারির কঙ্কার, হরজা হঠাৎ খুলে গেল : হরজার চৌকাঠে লীজার পাড়িয়ে।

নামান্ত সেক্রেটারী উঠে পাড়াল আড়ই ভাবে, সেই বিশাল পুরুষ তাকে দেখছেন খুব খুঁটিয়ে। তিন বছর পর লীজার এসেন এই প্রথম তার কাজের দরে! সে ভাবতে পারছে না, 'তার দুর্ভাগ্য এই রাজ এসে পাড়িয়েছে চৌকাঠে।'

ব্যাকরণের কাজে লীজার আসেননি। ঘটনা হচ্ছে, তিনি একজন লোক খুঁজছেন যাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, অর্থাৎ এমন একজন যাকে এই প্রাণাধারে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। লাইব্রেরীর পাশ দ্বিহে বাবার সময় তার এই সাহিত্য কিংবদন্ত সেক্রেটারীর কথা মনে পড়ে, একজন খুবক, যার সঙ্গে রাকসীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলে হয়তো একে এখানো খুব খোঁজা হয়নি...

হুজব বেহরকী কাপ্যারকে ডরানি করল, অল্প আছে কিনা, তারপর তাকে যার করে দিল। সে গবিতভাবে চলে গেল; তার ভাবী জাহাই তাহলে দেখা যাবে এই প্রাণাধারের বিভাজ্য নামান্ত লোক নয়। মহান লীজার তার খোঁজে আসেন, মেটা জন্ত লক্ষণ।

রাকসকেও ডরানি করা হল, অল্প আছে কিনা। তারপর কিন্তু লীজার তাকে একটা কাজের ভার দিলেন। তাকে স্পেন দেশের বিশেষ একজন

ব্যাঙ্কারের কাছে যেতে হবে, সবচেয়ে ভাল হয় খুব পথে গেলে, তাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে কেনে আসতে হবে, 'সীলারের' প্রাচ্যক্ষেপ বিকল্প অভিযানের আরোহনে শহরে যে বিশ্বয়কর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যাবে, তার উৎপ কোথায়।

এদিকে প্রবীণ লোকটি প্রাসাদের সামনে হুবকের অপেক্ষার রয়েছে। সে যখন এসে,—আসলে হুবকটি পেছনদিকের একটা পথে বেরিয়ে গেছে—তাপ্যার চলে গেল, তার পরিবারকে এই শুভ সূচনার খবরটা দিতে হবে। পথে একটা অকিস পড়ল, সেখানে সেনাপতি নাম লেখানো হচ্ছে। কেবল হুবকরা নাম লেখাচ্ছে। নিরাপত্তা থাকা, সেনাপতি হওয়া ভালই হবে। দৈনিক হবার বরল আর তার নেই।

এবার কয়েকটা ঘরের হোকামে চকর মারল, শহরতলির ছোট্ট হোটেলটার যখন গিয়ে পৌঁছল তখন তার একটুখানি নেশাবত হয়েছে। সে এখন রীতিমত সেনাপতি টেরেনটিউস তাপ্যার, আর তার বিরক্তি গিয়ে পড়ল লুকিলিয়ার সেই হুবকটির ওপর, সে এখনো এলে পৌঁছনি। সেক্রেটারী মশাই এখন এত বড় একজন যে তার নিজের তাবী দ্বীপ লড়ে দেখা করবারও সময় নেই? এদিকে এই পরিবারের চলবে কিসে? এই মুহূর্তে অসুস্থ তিনশো সেন্টাঙ্গি দরকার। লুকিলিয়াকে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে, সেট চারদার কারখানার মালিককে খুঁজে বার করতে হবে, তার কাছ থেকে ঐ তিনশো সেন্টাঙ্গি ধার নিতে হবে। লুকিলিয়া কাঁচছে। হাকস আসবে না, এটাও বুঝতে পারছে না। পাম্পিলিউস তাকে ঐ তিনশো সেন্টাঙ্গি দিতে দিখা করবে না, তবে সে তা গুনি গুনি করবে না। লুকিলিয়ার বাবা খুব রেগে গেছে। আর কোনো সন্দেহই নেই যে সেই ছোকরা আর 'এপথে আসবে' না। ওকে চুলোর দোরে পাঠানোর দরকার। ওকে জানাবো চলবে না যে সবাই ওর ভরসা বসে আছে। ওকে বেধিয়ে দিতে হবে, অস্ত্র লোকও আছে। লুকিলিয়ার দাম তারা জানে। লুকিলিয়া কাঁচতে কাঁচতে চলে গেল, তখনো আশা, হাকসের দেখা পেতে পারে।

সেই মুহূর্তে হাকস প্রাসাদে ফিরেছে। স্পেনীয় সেই ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে সে একটা কাইল পেয়েছে, সেটা সীলারের হাতে ভুলে ছিল। এবার অকিসে গিয়ে কিছু আগাম সেবার চেষ্টা করল। সেখানে সে নতীর আঘাত পেল। আগাম তো খেলই না, উপরন্তু তাকে জোরার পারার পক্ষে হল।

কুখাই তার মালিকের খোঁজ করল, অবশেষে বিকেন বেশ গড়িয়ে বেলে তাঁর রেখা পেল লাক্সানে সুকুরের বৌয়ের ওখানে। প্রানাদে ফেরবার পথে সে নীলারকে জানাল সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর হঠাৎ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল কি সাংঘাতিক বিপদ ঘনিরে আসছে ডিক্টেটরের, সে তখন বিশেষহারী হয়ে প্রজ্ঞা করল : নীলারের উচিত হবে সেই রাড্রেই গোপনে শহর ত্যাগ করা আর চোঁটা করা, ক্রিস্টিনিউব অবধি পৌঁছানো, যাতে সেখান থেকে বাহাঙ্গে চেষ্টা আমেরিকানিয়াতে তাঁর সেনাবলের ওখানে পৌঁছাতে পারেন। সে কথা ছিল, তাঁর মত একটা গুরু গাড়ী তৈরী রাখবে।—ডিক্টেটর হত্যোত্তর অবতার তাঁর নীড়ানে হেলান দিয়ে বসে, তার কপার উত্তর দিলেন না।

রাকস কিন্তু ঠিক করে ফেলেছে, এই পলায়নের সব ব্যবস্থা করবে। সেই বিশাল, অশান্ত, শুকবে সম্পৃক্ত রোবের ওপর বহন সজ্জা ঘনিরে আসছে তখন সে হকিপের পোর্টিকোর প্রহরীর সঙ্গে খুবের অঙ্ক নিয়ে কথা বলছে। ভেতরে চোকবার অল্পবতি পজ ছাড়াই গুরু গাড়ীটা মধ্যরাত্রির পর ভেতরে চুকবে। তার কাছে যা ছিল সব সে প্রহরীকে দিল। পুরো ডিনশো সেন্টাডি।

ম'টা নাগাব সে গিয়ে হাজির হল সেই হোটেলের কাপ্যারদের ওখানে। সে সুকিলিয়াকে জড়িয়ে ধরল। পরিবারের আর সবাইকে অল্পরোষ করল, টেরেনটিউল কাপ্যারের সঙ্গে একা কথা বলতে দিতে। তারপর সে সেই প্রবীণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “নীলারের মত তুমি কী করতে পার ?”

“চাষের জমির ব্যাপারটার অবস্থাটা কিরকম ?” কাপ্যার জিজ্ঞাসা করল।

“তার বারোটা বেছে গেছে”, বলল রাকস।

“আর সেনাপতির চাকরিটারও বারোটা বেছে গেছে ?” জিজ্ঞাসা করল কাপ্যার।

“সেনাপতির চাকরিটারও বারোটা বেছে গেছে”, বলল রাকস।

“কিন্তু, তুমি এখনো তাঁর বেকেরারী ?”

“হ্যাঁ।”

“তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ?”

“হ্যাঁ।”

“আর তুমি তাঁকে বিয়ে আশ্বাসের একটা ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পার না ?”

“কারো কোনো উপকার করবার কখনো তাঁর আর মেই। সব এসে-পাল্টে হয়ে গেছে। কাল তাঁকে একটা ইহুরের মত মেয়ে বেলা হয়ে। এবার বল, তাঁর কত তুমি কী করতে চাও?” প্রশ্ন করল সেক্রেটারী।

সেই বুড়ো লোকটি অবিখ্যালের লগ্নে বেথল তাঁকে ধুঁটিয়ে। মহান নীহার শেষ? এমন অবস্থা তাঁর যে টেরেনটিউস ক্যাপ্টানের সাহায্য করবার তাঁর?

“কিভাবে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি?” জিজ্ঞাসা করল ক্যাপ্টান।

“আমি তাঁকে তোমার গরুর পাড়ীটা দেব বলেছি,” সেক্রেটারী বলল শান্তভাবে। “তোমাকে মহা রাজির পর থেকে বক্ষিপের পোর্টিকোতে তাঁর অপেক্ষার থাকতে হবে।”

“আমাকে পাড়ী নিয়ে ওরা চুকতে দেবে না।”

“দেবে। সেজন্য আমি ওদের তিনশো সেন্টাভি দিয়েছি।”

“তিনশো সেন্টাভি? আবারের?”

“হ্যাঁ।”

বুড়ো লোকটি প্রশ্ন বিরক্ত ভাবে তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বেথল অবাক হয়ে। তারপর তার দৃষ্টিতে এল অর্বেক জীবন বার বার অভ্যস্ত লোকটির চুরছার অনিশ্চয়তা। তারপর বিভ্রিড় করতে করতে লগ্নে গেল।

বিভ্রিড় করে বলল, “হয়তো অন্য যে কোনো কাজের মতই এটা একটা ভাল কাজ। পালাতে পারলে তিনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন।”

তাঁর জীবনের প্রকৃত অবস্থার ক্ষিণতে পারলে তাঁর আবার ‘আশা’ আছে।

লুকিলিয়াকে বোঝানো বেশ শক্ত হল রাকলের শকে। ও রোমে রাকলকে আবার বেথার পর থেকে ওরা কখনো একা হতে পারেনি। রাকল বা ওর বাবা কেউই ওকে বলেনি, এতদিন কোন কাজে সে সবসময়ে ব্যস্ত ছিল। এবার ও তা জানতে পারল। তার ভাবী স্বামী নীহারের নকী। সেই পৃথিবীর শাসকের একমাত্র বিশ্বস্ত লোক।

কিন্তু সে কি লুকিলিয়ার সঙ্গে পনেরো মিনিটের জন্যও হুণ্কারখী-ডগাম্বেতে একটা রেভোরীর বেতে পারে না? পনেরো মিনিট নীহার একা থাকতে পারবেন না?

রাকল তাঁকে নিয়ে হুণ্কারখীডগাম্বেতে গেল। কিন্তু তাদের কোনো রেভোরীর বাওরা হল না। রাকল হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার পেছনে আবার

লোক লেগেছে। ছদ্ম শব্দেছদ্মক লোক তার পেছনে লেগে আছে, যেখানেই সে থাক না কেন, সেই সকাল থেকে। কাজেই দুই প্রেসম্পার হোটেলের সামনেই আলাদা হয়ে গেল। সুফিলিয়া তার বায়ের কাছে গিয়ে আনকে আশ্রয় করে জানাল, রাকস মহান সীজারের কত নিকট লোক।

এবিকে রাকস অহুলরণকারীদের হাত থেকে রেহাই পাবার বুঝা চেষ্টা করল।

মধ্যরাত্রির আগে সে জানতে পারবে, কমিশনারীদের সংস্পর্শে আসবার অর্থ কি।

এগারোটা নাগাধ রাকস আবার পৌঁছল প্রাসাদের চত্বরে। একহল নিগ্রো প্রাসাদ পাহারার তার নিরেছে। বেষ্ট্র ভাগ সৈনিকই বাতাল।

লাইবেরীতে তার ছোট্ট ঘরে সে উদ্ভাবের মত সেই কাইলটা উন্টে দেপল, কাইলটা সেট স্পেনীয় ব্যাকার একদিন আগে সীজারকে দেবার জন্য তাব হাতে দিয়েছিল। সীজার ওটা পড়ে দেখেন নি। এই কাইলের মধ্যে রয়েছে বড়বড়কারীদের নাম। সে সেট সমস্ত নাম বুঝে গেল। জটাস, ক্যালিগ্রাস, রোবের সামন্ত জোনেস ডোরে, সীজার বাধের বহু বলে মনে করে তাদের অনেক। সীজারকে এট কাইল পড়তেই হবে, এই মুহুর্তে, এই রাতেই। সে তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করবে, টেরেনটিউস ভাষ্যারের গরুর গাড়ীতে গিয়ে বসতে।

সে কাইলটা নিয়ে রওনা হল। করিডোরগুলো সব আবছা অন্ধকার, প্রাসাদের অন্য মহল থেকে বাতালদের পান ভেসে আসছে।

আক্টিউব-এর প্রবেশ পথে দুই বিশাল নিগ্রো পাহারা বিচ্ছে। তারা তাকে ভেতরে যেতে দিতে চায় না। তার কথা ওরা বোঝে না।

আরেক দিক থেকে সে চেষ্টা করল। প্রাসাদটা বিশাল। এখানেও নিগ্রো গ্রাহরী এবং প্রবেশ নিষেধ। করিডোরগুলো আর ল্যামের বাপান-ভনোতে চেষ্টা করল, জানালা টপকে যদি বাওয়া যায়। কিন্তু সব বন্ধ।

স্বস্ত হয়ে নিজের ঘরে ফেরবার পথে তার মনে হল, করিডোরের আরেক প্রান্তে একজনের পেছনটা যেন চিনতে পারল। তার পেছনে যারা লেগে ছিল, তাদের একজন।

আতঙ্কিত ভাবে সে ছুটে ছুটে শব্দ নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে দিল। আলো জ্বাল না, জানলা দিয়ে দেখল বাইরের আধিরা। সেখানে তার

জানালার দিক দিয়ে বসে আছে দ্বিতীয় লোকটি। ঠাণ্ডা ঘাবে সে ভিত্তে উঠল।

সে অনেকক্ষণ বসে রইল অস্বস্তিকার ঘরে, কান পেতে রইল। একবার হঠাৎ চোখ পড়ল। রাকুল খুলল না। কাজেই যে লোকটা তার হঠাৎ নামে কিছু শব্দ অপেক্ষা করে আবার চলে গেল, তাকে সে দেখল না—সীজার।

মধ্যরাত্রির পর থেকে টেরেনটিউল ছাপারের গরুর গাড়ী হৃদয়ের পোর্টিকোর নামে দাঁড়িয়ে রইল। সেই অভিজ্ঞ সৈনিক তার স্ত্রী এবং ছেলে-বেয়েকে শুধু বলে এসেছে, তাকে এক জায়গায় বেতে হচ্ছে, হুঁচকার মিন রোদের বাইরে থাকতে হবে। সুকিলিয়া আর তার মা যেন রাকুলের ওখানে যায়, সে তাদের ব্যবস্থা করবে।

যাই হোক সেই রাতে কেউ হৃদয়ের পোর্টিকোতে গরুর গাড়ীতে উঠে বসতে এল না।

১৫ই মার্চ ৬০রে ডিক্টেটরকে জানান হল, রাতে তার সেক্রেটারী প্রাণাধার মধ্য খুন হয়েছে। বড়বাক্যকারীদের নামের তালিকা উদ্ধৃত। সেইসব নাম বাদে, তাদের সঙ্গে সীজারের দেখা হবে সকালে সিনেটে আর তাদের ছোয়ার আঘাতে তিনি অর্জিত হবেন।

একজন প্রবীণ সৈনিক এবং দুর্দশাগ্রস্ত চাবী একটা গরুর গাড়ী চালিয়ে শতরতলির এক হোটেলে ফিরে আসবে, সেখানে একটা ছোট পরিবার অপেক্ষা করবে, সেই পরিবারের কাছে মহান সীজারের জগের পরিমাণ তিনপোঁ সেস্টাভি...



ডা ক্রিস্টোফার সেই সৈনিক

দক্ষিণ ফ্রান্সের ছোট্ট বন্দর লা ক্রিস্টোফালে জাহাজের রিলে রেন্ উপলক্ষে এক উৎসব হয় প্রতি বছর। প্রথম মহাবুদ্ধের পর আমরা সেই বেলার এক খোলা জায়গায় করাসী সৈন্য বাহিনীর এক সৈনিকের ব্রোঞ্জের পূর্ণ মূর্তি দেখতে পাই, সবাই ভীড় করে সেই দিকে যাচ্ছিল। আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ওটি একটি জীবন্ত মস্তক, ছিন্ন ভাবে বেটে রঙের ওড়ারকোট পরে, লোহার হেল্মেট মাথায়, বেরোনেট হাতে জুন মাসের প্রথম রোদ্দুরে একটা পাখরের বেহী ওপর ঝড়িয়ে। তার মূখ এবং হাতছুটি ব্রোঞ্জের রঙ দিয়ে রাঙানো। তার কোনো পেশী নড়ছিল না, এমনকি তার চোখের পলকও নড়ছিল না।

তার পায়ের কাছে বেহীতে এক টুকরো পিচবোর্ড হেলান দিয়ে রাখা, তার ওপর লেখা আছে :

মূর্তি মানুষ

“আমি, চার্লস লুই ফ্রানসার্ড, তার রেজিমেন্টের সৈনিক, ভার্সাইর কাছে আক্রমণ হইরা বাইবার পর চট্টতে নিক্ষেপে সম্পূর্ণ ছিন্ন অবস্থায় রাখিবার এবং ইচ্ছানুসারে ‘একটা মূর্তির রত’ রাখিবার এক অস্বাভাবিক ক্রমতা অর্জন করিয়াছি। আমার এই ক্রমতা অনেক অধ্যাপক কর্তৃক পরীক্ষিত এবং একটি ব্যাখ্যাহীন রোগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতুগ্রহ করিয়া একটি বেকার কিন্তু পরিবার পালককে সামান্য সাহায্য করুন।”

সেই বোর্ডের পাশে রাখা একটা খালি ওপর একটা মূর্তা কেনে দিয়ে রাখা নাড়তে নাড়তে অন্তরিকে সেলাম।

ভাবছিলাম, এখানে তাহলে লোকটা ঝড়িয়ে আছে, সম্পূর্ণ ভাবে অস্বাভাবিক এক অবিনশ্বর সৈনিক, কয়েক হাজারের মধ্যে একজন, যে ইতিহাস খুঁটি করেছে, যে আসেন্সাওয়ার, সীজার, নেপোলিয়ন-এর সব মহৎ কীর্তিকর্ম সম্বল করেছে, আর সেসব কথা আমরা স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে পড়ি। এই সে।

এর চোখের পলক পড়ে না। এই সেই নাটরান-এর বহরগ, কাবিল-এর
 বহুসজ্জিত রথের সারথী, যাকে বহুবীর্য বাসু সম্পূর্ণভাবে কবর দিতে পারেনি,
 নীকারের নৈমিক, চেবিল খান-এর বহুসজ্জিত অঝারোহী, চতুর্গুণ সুভাষিত-
 এর সেই ছইল লোকটি এবং প্রথম নেপোলিয়ন-এর গোলদ্বার। এ সেই
 কবতার অধিকারী, বা আদতে তেমন অস্বাভাবিক নয়, নিজেকে বাবতীরবিকালী
 অস্ত্র-শস্ত্র তার ওপর পরীক্ষিত হলেও উপেক্ষিত রাখতে পারে। এ পাথরের
 হস্ত, অচেতন (সে বলে), বৃত্তার মুখে ঠেলে দিলেও অবিচল। প্রস্তর-বৃণ,
 ব্রোক-বৃণ, লৌহ-বৃণ, এই সব বিভিন্ন বৃণের বর্ণার আদাতে বিভ্র; আরটাক্সার্ম-
 এর এবং জেনারেল লুডেনভর্ক-এর বৃত্তবানে পিঠ; হার্মিডাল-এর হাতিয়ার পায়ে
 আর আভিলাস বোভসওয়ার হলের খুরের তলার কত-বিভ্র, বহু শতাব্দীর
 উন্নততর অস্ত্রের উদ্ভব ধাতব পদার্থে ধ্বংসীকৃত, আবার প্রাচীন কেপগার্নের
 পাথরে, বহুবীর্য গুলিতে ঝাঁকরা হয়ে, তাদের কোনোটা পাথরের ভিতরে
 লমান, কোনোটা মোহাছির, ঝাড়িয়ে আছে। অধিনবর, বারেবারেই নতুন
 করে, বহু ভাবার আদেশ পেয়ে, কিন্তু সব সময়েই কেন বা কি জন্ত তা না
 জেনে। যে সমস্ত দেশ সে জয় করেছে সেগুলো সে অধিকার করেনি, যেমন
 রাজমিস্ত্রী তার তৈরী বাড়ীতে বাস করে না। যে দেশ সে রক্ষা করেছে
 সেটাও তার নয়। এমন কি তার অস্ত্র বা সজ্জা তার নিজের নয়। কিন্তু সে
 ঝাড়িয়ে আছে, তার ওপর উদ্ভোজাহাজের বৃত্তা-বর্ণণ আর নগর প্রাচীরের
 জলন্ত হুত্যাণ্য, তার পায়ে তলার মাইন আর কাঁদের গর্ভ, তার চারদিকে
 জীবাসু আর হলুদ চেড়াকটা গ্যাস, বর্ণা আর তীরের রক্তমাংসের চৌপ,
 লক্ষাবিন্দু, ট্যাঙ্কের হস্ত, গ্যাসের স্টোভ, তার সামনে শত্রু, পেছনে জেনারেল !

অসংখ্য হাত, সেগুলো তার কোট বুনেছিল, অস্ত্র তৈরী করেছিল, বৃত্তান্তে
 বানিয়েছিল। অসংখ্য বলে, সেগুলো তার সাচাষো বোকাই হয়েছিল !
 হুনিয়ার 'বাবতীর' ভাবার অপরিমিত আর্ভন্য তাকে উত্তেজিত করেছে !
 তাকে আশীর্বাদ করবার জন্ত কোনো ঈশ্বর নেই ! তাকে বৈবের অস্ত্র হুঁট
 আক্রমণ করেছে, অচেতনতার সেই চিকিৎসার অসংখ্য রোগ অস্ত্র-সারথী
 করে দিয়েছে !

কেমন সেই আচ্ছন্নতা, আঘাত ভাবছিল, বার কলে তার এই বশা, এই
 অস্ত্র, প্রচণ্ড, এমন নিবাক্ষ হোয়াচে রোগ ?

আঘাতের মধ্যে এর আগছিল, এর চিকিৎসা কি সত্যিই নেই ?



আহত সন্তোষ

স্বাই-এর ছেলে সন্তোষ তাঁর কথাবার্তার বন্ধুদের মধ্যে খুব ভালভাবে, সহজে এবং নির্ভর ঠাট্টার মাধ্যমে হৃদয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতেন এবং অজান্তে শিকবন্ধের মত তাদের বেজব্বা না ভেবে নিজের সন্তানদের মত ব্যবহার করতেন। তিনি ঐক্যের মধ্যে গুণ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেই পণ্য ছিলেন না, একজন অজান্তে সাহসী বলেও পণ্য ছিলেন। যখন আমরা প্লেটো পড়তে গিয়ে দেখি তাঁর কৃতকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে অবশেষে ওপরওয়ারার পাঠানো হেরলক-এর পাত কেমন সহজে এবং অনায়াসে নিঃশেষ করেছিলেন, তখন তাঁর সাহসী নাম প্রতিষ্ঠিত বলেই আমাদের মনে হয়। তাঁর প্রতি প্রত্যাশিত লোকের মধ্যে করেকজন কিন্তু দুঃক্ষেত্রে তাঁর সাহসের কথাও বলা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে ডেলিওস-এর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, এবং তাও সাহস অস্ত্রে সজ্জিত পরাতিক বাহিনীতে, কারণ জাতিতে তিনি ছিলেন মুচি এবং বৃত্তিতে দার্শনিক, অর্থাৎ উপার্জনের হিসেবে মূল্যবান অস্ত্রে সজ্জিত হবার অধিকার তাঁর ছিল না। বাই হোক, ভেবে দেখলে বোকা যায়, তাঁর সাহসিকতা ছিল এক বিশেষ ধরনের।

যুদ্ধের দিন সকালে সন্তোষ সেই রক্তাক্ততার কারবারের অন্ত কথা সম্ভব প্রকৃত হয়েছিলেন, সেজন্য পেরাজ চিবিরেছিলেন, সৈনিকদের ধারণা, তাতে সাহস বাড়ত। বহু ব্যাপারে তাঁর দিবার কল অন্য অনেক ব্যাপারে তাঁকে সরল বিধানী করে তুলেছিল; তিনি ধারণার বিরোধী এবং প্রকৃত অভিজ্ঞতার বিধানী ছিলেন; আর তাই ঐক্যে বিশ্বাস করতেন না, তবে পেরাজে কিন্তু বিশ্বাস করেছিলেন।

আপুসোনের কথা প্রকৃত কোনো কল তিনি তাঁর পাননি, অজান্তপক্ষে তৎক্ষণাৎ কোনো কল তিনি পাননি; কাকেই মননরা ভাবে তসোয়ার বাহিনীর সঙ্গে নিত্যকাল বেতে হয় তাই রক্তমা হলেন, সবাই বলে রাখাীদের মত হলে হলে কোনো একটা কলকে কেটে নেওয়া মার্কের দিকে রক্তমা হল যুদ্ধের জন্য

প্রভুত হতে। তাঁর আগে এবং পেছনে এবেল-এর শহরতলির দুই যুবক, তারা তাঁকে জানায়, এবেল-এর কারবারশালার তৈরী চালগুলো তাঁর বড় মোটা লোকের পক্ষে বড় ছোট করে কাটা। তাঁর নিজের হারপাও তাই ছিল। শুধু তাঁর কাছে 'চওড়া' লোক ছিল, যাদের আধখানাও ঐ চালে ঢাকা পড়ত না, হালির খোরাক হত।

সাবনের এবং পিছনের লোকের সঙ্গে সেইসব বড় বড় আর কারবারীর এরকম অভ্যস্ত ছোট চাল তৈরীতে কত লাভ হতো সেই আলোচনার বাধা পড়ল 'তীবু খাটাবার' হকুমে।

সবাই সেই কসলের খোঁচা খোঁচা মূলের ওপর বসে পড়ল, একজন সেনাপতি এসে সজ্জেটিসকে সাবধান করে দিল, কারণ তিনি তাঁর চালের ওপর বসবার চেষ্টা করেছিলেন। গুপ্তচর বা পারেনি তার চেয়ে বেশী অবজ্ঞিতে পড়েছিলেন তিনি সেই চাপা গলার স্বরে।

শত্রুপক্ষ কাছাকাছি কোথাও আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল।

সকালের সাপাটে কুয়াশা কিছু বেখতে দিচ্ছিল না। পায়ের নখ আর অয়ের ঝংকারে তবুও বোকা বাড়িল, ওই জায়গা অধিকৃত।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সজ্জেটিসের একটা আলোচনার কথা মনে পড়ল। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই আলোচনা হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে, তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল গোপনে, আর সে অস্বারোহী বলে অকিসার।

“একটা দাঁড়প পরিচালনা!” বলেছিল সেই যুবক পুতুলটি। “শরাতিক বাহিনী শ্রেক ধাড়িয়ে থাকবে বিন্দু এবং অনড়ভাবে আর শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। আর এদিকে অস্বারোহীরা এগিয়ে বাবে চালু জমির দিকে, গুহের পেছন দিক থেকে আঘাত হানবে।”

চালু জমিটা ভানদিকে বেশ খানিকটা দূরে, কুয়াশার মধ্যে কোথাও হবে। বোধহয় অস্বারোহীরা সেদিকেই তখন রওনা হয়েচে।

পরিচালনাটা সজ্জেটিসের ভালই মনে হয়েছিল, অন্তত পক্ষে খারাপ মনে হয়নি। সবসময়েই তো পরিচালনা করা হয়, বিশেষ করে শত্রুপক্ষের চেয়ে দুর্বল হলে। আসলে তখন শ্রেক বৃদ্ধ হয়, অর্থাৎ আঘাত করা হয়। আর পরিচালনা কি ছিল তা নিয়ে কেউ ভাবে না; শত্রুপক্ষ যেখানে এগোতে দেয়, সেইদিকেই এগোনো হয়।

তখন সেই ভোরের আলোর সজ্জেটিসের কাছে পরিচালনাটা বিভাঙই

বাহ্যে মনে হল। পদাতিক বাহিনী শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করবে—
তার অর্থ কি? সাধারণভাবে কোনো আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারলেই খুশি
হবার কথা, আর এখন কাজটা ঠাড়াচ্ছে আক্রমণ প্রতিরোধ করা! প্রধান
সেনাপতি নিজে যে একজন অব্যাহারী সেই ব্যাপারটা বেশ খারাপ।

সাধারণ একজন মাহুকের বড় পেরাজ দরকার, তত পেরাজ বাজারে
পাওয়া যায়নি।

আর কেমন এক অব্যাহারী ব্যাপার, এই সকালে কোথার বিছানার
তরে থাকবে, তা না, এক মাঠের মাঝখানে মাটির ওপর বসে থাকা, আর
সারা পায়ে অন্তত বন পাউণ্ড লোহা আর হাতে একটা মাহুকাটা ছুরি।
শহর আক্রান্ত হলে তাকে রক্ষা করতে হবে, একথা ঠিক, কারণ তা না হলে
সেখানে যথেষ্ট কামেলা হবে। কিন্তু শহর আক্রান্ত হবে কেন? কারণ
আহাজের মালিকরা, আঙুর বাগানের মালিকরা আর ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা
এনিয়ার পাশী আহাজের মালিক, আঙুর বাগানের মালিক আর ক্রীতদাস
ব্যবসায়ীদের বার্ষিক ব্যাঘাত লুট করছে! চমৎকার কারণ!

হঠাৎ সবাই বেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

বাহিকের কুয়াশার ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড চিংকার ভেসে এল, সেট
সঙ্গে ধাতব শব্দ। বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

বাহিনী উঠে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে কুয়াশার মধ্যে দেখতে চেষ্টা
করল। বন পা হুয়ে একপাশে একজন হাঁটু ভেঙে পড়ল আর অশ্রু দিয়ে
কঁপেরে মাখ নিল। সকেটিসের মনে হল, বড় দেরী হয়ে গেছে।

হঠাৎ আরো ডানদিক থেকে একটা ভয়ঙ্কর চিংকার শোনা গেল, বেন
উত্তর এল। সাহাবোর আশায় করা চিংকারটা মনে চল মরণ বহুপার
চিংকারে পরিণত হল। সকেটিস দেখলেন, কুয়াশার ভেতর থেকে একটা
লোহার ভাঙা উড়ে আসছে। একটা বর্ণা!

এবার সাহাবের দিকে কুয়াশার কাপলা বিশাল বিশাল চেহারা ভেসে
উঠল—শত্রু।

সকেটিসের নিশ্চিত ধারণা হল, হয়তো বাক্স বেশী সময় নষ্ট করা হয়ে
গেছে, আনাতীর বড় ছুরে বৌড় শুরু করলেন। বর্ষ আর ভারী পা-চাকার
বড় বেশ অহুবিধা লুট করছিল। চালের চেয়ে শুকনো অনেক বিপজ্জনক,
কোনো দুর্ভে কয়েক দেওয়া যায় না।

বার্ষিক দৌড় দিচ্ছে কলকাতা। মাঠের ওপর দিয়ে হাঁকাতে হাঁকাতে। সব কিছু নির্ভর করছে যথেষ্ট দূরত্বে এগিয়ে যাবার ওপর। আশা, অল্পপত ব্যবস্থা পিছনে কিছু সময়ের জন্য আক্রমণ প্রতিহত করবে।

হঠাৎ একটা জঘন্য ব্যাধি অতীব করলেন। তাঁর বাঁ পায়ের পাতা জলে বাজে, তাঁর মনে হল, তিনি আর লড়াই করতে পারবেন না। আত্মনাস্তি করে বসে পড়লেন, কিন্তু নতুন করে যন্ত্রণার কাতরে আবার উঠে দাঁড়ালেন। পাগলের মত তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারলেন। একটা কাটা-কোপের মধ্যে এসে পড়েছেন!

ছোট ছোট কাটাকোপ, ভয়ঙ্কর সব ছুঁচোলো কাটার বোকাই। পায়েও নিশ্চয় একটা কাটা বিঁধেছে। ছুঁচোখে জল, সাবধানে বসবার মত একটা জায়গা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলেন। অন্য পায়ে লাকিয়ে লাকিয়ে কয়েক পা চকর দিয়ে একটা জায়গায় বসলেন। কাটাটা তক্ষুণি বার করে ফেলতে হবে।

উদ্বেজিত অবস্থায় গুনতে পেলেন বুকের হজা। ছুপাশের বেশ খানিকটা জায়গা, দূর থেকে সেই আগুয়াজ আসছে, তবে সামনের দিকে অন্ততপক্ষে একশো পা দূরে। বাই হোক মনে হল শব্দ এগিয়ে আসছে, ধীরে ধীরে তবে নিতুল ভাবে।

সক্রেটিস ত্রাণেলটা খুলতে পারলেন না। কাটাটা পাতলা চামড়ার শোলার মধ্য দিয়ে ঢুকে গিয়ে মাংসের মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে গেছে। বেশব লৈনিকরা মাতৃহৃদি রক্ষা করবে তাদের যে কি করে এত পাতলা জুতো দিতে পারে! ত্রাণালে চাপ পড়লেই একটা জলন্ত ব্যাধি টের পাওয়া বাজে। বিমর্ষ ভাবে সেই বেচারী তাঁর চওড়া কাঁধ সজ্জিত করলেন। কি করবেন?

তাঁর বিবর চোখ পড়ল পাশের তলোয়ারের ওপর। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল, যে কোনো বিতর্কমূলক আলোচনার চেয়ে উৎসাহজনক। তলোয়ারটা ছুরি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না? ওটার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

সেই মুহূর্তে গুনতে পেলেন হাজা পায়ের শব্দ। একটা ছোট্ট হল সেই কোঁপের মধ্য দিয়ে আসছে। ঈশ্বরদের দয়া, ওরা নিজেদের লোক! তাঁকে দেখতে পেয়ে ওরা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। “এ সেই মুচিটা”, ওদের বলতে গেলেন। তারপর তারা চলে গেল।

কিন্তু তাদের বীহিক থেকেও এবার হুগা শোনা গেল। আর সেখানে
বিশেষী ভাষার আদেশ দিতে শোনা গেল। পার্শ্বারা!

সক্রেটিস চোটা করলেন উঠে দাঁড়াতে, অর্থাৎ তান পায়ের ওপর।
তলোয়ারের ওপর তর দিয়ে দাঁড়াতে চোটা করলেন, ওটা আবার একটু বেশী
খাটো। তারপর বীহিকের কোণের কাঁকে দেখলেন এক বহল সৈনিক বৃদ্ধ
করছে। ওনতে গেলেন গোড়ালির শব্দ আর তৌতা লোহা দিয়ে লোহা
কিছু চানড়ার ওপর আঘাতের শব্দ।

হিংস্কারা হয়ে তিনি ভাল পায়ের ওপর লাকাতে লাকাতে পিছু হটতে
শুরু করলেন। পা মচকে আবার আহত পায়ের ওপর দাঁড়াতে গিয়েই
আতলাহ করে বসে পড়লেন। সেই বৃদ্ধরত বহল বধন আর হাত্ত করেক পা
দূরে এসে পড়েছে, হলটা ভেমন বড় নয়, কুড়ি তিরিশ জন হবে, তখন সেই
দার্শনিক বৃদ্ধো কাটা কোণের হাঙ্গরখানে বসে, অসহায় ভাবে শত্রুদের দিকে
ডাকিয়ে।

তার পক্ষে নড়াচড়া করা অসম্ভব। পায়ের গোড়ালির ঐ বাধা আর
একবারও অতুভব করার চেয়ে আর সবকিছুই ভাল। কি করবেন বুঝতে
পারছেন না, তারপর হঠাৎ শুরু করলেন হুগার দিতে।

সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি ওনতে গেলেন, তিনি হুগার
দিয়েছেন। ওনতে গেলেন, তার ঐ বিশাল বৃকের ভেতর থেকে হুগার বের
হচ্ছে, যেন একটা হুড়কের মধ্য থেকে : “এই বে, এদিকে ! খার্ড ব্যাটেলিয়ন !
ওদের মধ্য টের পাইয়ে দাও। এল হে !”

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করলেন, তিনি তলোয়ারটা ভুলে নিয়ে
যোরাচ্ছেন, কারণ তার সামনে বর্শা হাতে এক পার্শ্ব সৈনিক এসে হাজির
হয়েছে। বর্শাটা একপাশে ছিটকে সরে গেল, সেই সঙ্গে হাঙ্গরটা।

সক্রেটিস দ্বিতীয় বার নিজেকে হুগার দিতে ওনলেন, বলছেন :

“এক পা-ও পেছাবে না আর, ডাইসব ; এবার পেয়েছি ওদের, যেমনটা
চেরেছিলাম, হুগার বাজা শব্দ ! ক্রাপোলুল, ছয় নম্বর নিয়ে এসিয়ে যাও !
হুগোল, ডানদিকে ! বে পিছু হটবে, তাকে আবি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো
করব !”

তার পাশে নিজেদের হুগলকে বেখে অবাক হলেন, তারা হতাশভাবে
ডাকিয়ে আছে বোকার মত। তিনি বীচু গলার বললেন, “চিংকার কর,

বোহাই জোরামের, চিংকার কর।” একজন আভয়ে হাঁ করে রইল, কিন্তু অন্য জন সত্যিই হুকার দিয়ে উঠল, বা খুঁই। আর তাহের সাহনের পাশীরা অতি কটে উঠে বোপের মধ্যে পালিয়ে গেল।

বোপের কাক দিয়ে তখন খানেক ক্লাস্ত লোক উলড়ে উলড়ে এল। পাশীরা সেই হৈ-হুয়া শুনে পালিয়ে গেছে। পেছনে আরো লোক-লতর আছে ভেবে ভয় পেয়ে গেছে। “কী হয়েছে এখানে?” সক্রোটসের একজন বেশগুরাদা জিজ্ঞেস করল; সক্রোটস তখনো মাটিতে বসে।

“কিছু না”, ইনি বললেন। “ওরকম ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে আমার দিকে টা করে তাকিয়ে না থেকে বরং এদিক ওদিক ছোট্টাছুটি কর আর হুকুম চালিয়ে বাও, বাডে ওপকের ওবা টের না পার, আমরা সংখ্যার কত কর।”

“বরং আমরা ফিরে যাই”, বলল সেই লোকটা অনিচ্ছা ভরে।

“এক পা-ও না”, প্রতিবাদ করলেন সক্রোটস। “তোমরা কি ভীড় পাররা?”

ভয় পেলে ওসব কথাই সৈনিকদের কোনো কাজ হয় না, কিছুটা ভাণ্ডাও হরকার। তখন শোনা গেল, বেশ দূর থেকে তবে স্পষ্টে, ঘোড়ার পারের শব্দ আর বীভৎস চিংকার, আর সেই ভাষা ঐক্। সবাই জানে, সেদিন পাশীরা কেমন বিপর্যস্ত হয়ে হেঁরে গেছিল। বৃদ্ধ শেষ।

আলকিবিয়াডেস যখন ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে সেই কাটা বোপের মধ্যে এল, তখন দেখতে পেল, পহাডিক সেনারা একজন মোটা লোককে কাঁধে করে চলেছে বিহিল করে।

ঘোড়া খামিরে বেধে চিনতে পারল, লোকটা সক্রোটস, আর সেনারা জানাল, তিনি ভয়লেশহীন ভাবে বাধা দিয়ে আটকে রেখেছিলেন।

ভারা তাঁকে উল্লাস ভরে ছাউনি অবধি কাঁধে করে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর প্রতিবাদ লম্বেও তাঁকে একটা হালগাড়ীতে বসিয়ে, যানে ভেজা অবস্থায় তাঁকে ঘিরে উত্তেজিতভাবে চিংকার করতে করতে সৈন্যরা রাজধানীতে ফিরে এল।

তাঁর স্ত্রী জ্যানথিলে তাঁর অন্য মটরওঁটির স্থাপ রান্না করতে বসল। হাঁটু দেখে উল্লসের সামনে বসে গাল ফুলিয়ে হুঁ দিতে দিতে দিতে তাঁর স্ত্রী মাঝে মধ্যে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যে চেয়ারে বসিয়ে রেখে গেছিল, তিনি তখনো সেখানেই বসে।

“কী হয়েছে তোমার ?” জিজ্ঞাসা করল তাঁর স্ত্রী অবিবাহের হয়ে।

“আমার ?” বিড়বিড় করলেন, “কিছু না।”

“তোমার বীরত্বের কথা বেশব শোনা যাচ্ছে, সেসব তাহলে কী ?” জানতে চাইল।

“বাড়াবাড়ি সব”, তিনি বললেন, “পছন্দটা চমৎকার।”

“উহুনে খাচই হিলাব না, অথচ পক্ষ বের হল ? তোমার বুদ্ধি-হুজি সব আবার গুলিয়ে গেছে, তাই না ?” বিরক্ত হয়ে বলল। “কাল কটি আনতে গেলে তো আবার হাসাহাসি গুনতে হবে।”

“আমার বুদ্ধি-হুজি মোটেও গুলিয়ে যায়নি। আমি হুজু করেছি।”

“ভূরি বেশা করেছিলে ?”

“না। ওরা যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন আমি ওদের কুখে ঠাড়াতে বলেছিলাম।”

“ভূরি তো নিকাই পার না কুখে ঠাড়াতে”, উঠে ঠাড়াতে ঠাড়াতে বলল তাঁর স্ত্রী, তখন উহুন অলে উঠেছে। “টেবিলের ওপরে হুনের পাজটা আছে, ধাও তো।”

“ঠিক বুঝতে পারছি না।” বললেন বীরে-হুজে চিন্তিত ভাবে, ‘ঠিক বুঝতে পারছি না, আদৌ কিছু খাওয়াটা উচিত হবে কিনা। পেটটা একটু পুগুখোল করছে।’

“আমি তো বললামই, ভূরি বেশা করেছ। উঠে ঠাড়াও বেশি একবার, ঘরের মধ্যে ছ’শা ঠাটো, তাহলেই বোকা যাবে।”

ওর এই অন্যায ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হলেন। কিন্তু তিনি কোনো-ক্রমেই উঠে ঠাড়িয়ে জানতে দিতে চান না যে তাঁর চলবার কন্যতা নেই। মহিলাটি অত্যন্ত চালাক, বিশেষ করে তাঁকে অপহাস্য করবার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। আর হুজে তাঁর কুখে ওঠার আসল কারণ প্রকাশ পেলে বেশ অবজ্ঞিতে পড়তে হবে।

ও তখন উহুনের ওপর কড়াইটা নিয়ে ব্যস্ত, তারই কীকে কীকে জামাল তার ঘরের কথা।

“আমি ঠিকই জানি, তোমার ঐসব বড়লোক বড়ুরা তোমাকে আবার লবার পেছনে, নৈজতের রুজইখানার হাতা ঘরের কাছের তার বিয়েছিল। ওসব থান্না ছাড়া আর কিছুই না।”

ব্যবহৃতভাবে তিনি আনানার কাঁচ দিয়ে গলির ভেতরে ডাকালেন, সেখানে বহু লোক উদ্ভল আলো নিয়ে চলেছে, বিকর উৎসব পালন করা হচ্ছে।

তার সম্মুখ বন্ধুরা ও-কাতীর চেষ্টা করেনি, আর তিনিও তা যেনে বিভ্রম না, অন্তত অত সহজে নয়।

“নাকি ওরা একটা মূর্খি সঙ্গে গেছে দেখেই খুঁশী? ওরা তোমার জন্য কড়ে আছুলটাও নাড়বে না। ও একটা মূর্খি, ওরা বলে, ওর মূর্খি থাকাই উচিত। নইলে আমরা ওর এই মোংরা কোকরের মধ্যে কেন বাব, আর ঘটীর পর ঘটী ওর সঙ্গে বকর বকর করব, আর সাগা দুনিয়াকে বলতে শুনব—বেখতো, ওটা মূর্খি কিনা, এইসব বড় বড় লোকেরা ওর কাছে বলে আছে বেখছি আর ওর সঙ্গে ফিলারসোফি নিয়ে কথা বলছে। বত সব হাবিঝাবি।”

“কখাটা ফিলারফোবি”, তিনি বললেন ঠাণ্ডা মাথার।

তার স্ত্রী একটা ভিক্ত নৃষ্টি ছুঁড়ে যারল।

“আমাকে অত জ্ঞান দিও না সব সময়ে। আমি জানি, আমার অত বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। থাকলে যখন তখন তোমার পা ধোবার জল এগিয়ে দেবার লোক পেতে না।”

তিনি শিউরে উঠলেন, আশা করলেন তার স্ত্রী সেটা লক্ষ্য করেনি। আজ কোনোরঙেই পা ধোওয়া চলবে না। ঈশ্বরদের আশীর্বাদে সে তার বকবকানি চালিয়ে গেল।

“বেশ, তুমি বেশা করনি আর হাঙ্কা কাজও ওরা তোমাকে দেয়নি। অর্থাৎ তুমি সত্যিকারের একজন যোদ্ধার কাজ করেছ নিশ্চয়। তোমার হাতে রক্ত লেগেছে, তাইতো? কিন্তু আমি যখন একটা হাকড়সা মাড়িয়ে দিই, তখন তুমি হৈ হৈ করে ওঠ। এমন নয় যে আমি বিশ্বাস করি, তুমি সত্যিই একটা কাজের কাজ করেছ, তবে একটা কিছু চালাকি, একটা কিছু প্যাচালো কাজ তুমি নিশ্চয় করেছ, বার জন্য ওরা সব তোমার পিঠ চাপড়াকে। তবে আমি ঠিকই সেটা বার করব, তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।”

স্বপ্ন ভেড়ী। গড়ে লোভ হয়। বহিলাটি তার শোশাকের কোণা দিয়ে কড়াই-এর আঁটা ধরে নামিয়ে টেবিলের ওপর রেখে হাতা দিয়ে ঢাকতে শুরু করল।

তিনি একবার ভাবলেন, বাবার ইচ্ছাটা কিরে পাণ্ডরাটা উচিত হবে কিনা। ভাবলে যে তাঁকে টেবিলে নিয়ে বসতে হবে সেই চিন্তাই তাঁকে সময়মত বিরত করল।

অতটা লাহল তাঁর ছিল না। তিনি বেশ বৃদ্ধে প্যারছিলেন, ব্যাপারটার ঠিকি শুধনো হয়নি। শিগগিরই আরো কত অব্যক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবেই হবে। পাশীনের সাথে একটা বুকেই সব বীয়াংসা হয়ে যাবনি এবং চাড় পাণ্ডরা যাবে না। এখন, জরের এই প্রথম উল্লাসের কোঁক, কার জন্য এই জ্বর একথা কেউই ভাবছে না। সেটাই আভাবিক। সবাই ব্যস্ত তার নিজের বাগান্ধুরির কথা চতুর্দিকে ছড়াতে। কিন্তু কাল কিবা পরন্ত সবাই চরতো বেথবে যে বহুটি সব কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে বসে আছে, আর তখন লোকে তাঁকে তুলে ধরতে চাইবে। অনেক তখন অনেক বৃত্ত বার করতে পারে, যদি তারা এই মুচিটাকে প্রকৃত বীর বলে ঘোষণা করে। আলকিবিয়া-ডেসকে লোকে এমনিতেই তেমন পছন্দ করে না। ঘটনাক্ষে লোকে তাকে বলতে পারে—তুমি বুকে জিতেছ, তবে একটা মুচি সে বৃদ্ধ করেছে।

এদিকে কাঁটাটার যন্ত্রণা আগের চেয়ে বেড়েছে। ত্রাণ্ডলটা জলদি খুলে কেমনে না পারলে রক্ত বিধিরে উঠতে পারে।

“অন্ত হাপুল হপুল করো না”, অন্যমনস্কভাবে বললেন।

স্ত্রীর মুখের মধ্যে চামচটা আটকে গেল।

“কী করছি?”

“কিছু না”, ভর পেয়ে তাড়াতাড়ি কড়াট এড়ানোর জন্য বললেন।

“আমি কি একটা চিন্তা করছিলাম।”

স্ত্রীর রেগেবেগে উঠে পড়ে কড়াইটা ছুঁ করে উঠনের উপর রেখে বাইরে চলে গেল।

লক্কেটস একটা লম্বা নিখাল কেসে নিশ্চিন্ত হলেন। তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে, কুণ্ঠিত ভাবে এদিক ওদিক বেগতে বেগতে, এক পায়ে লাকিরে লাকিরে পেরন দিকে নিজের জায়গার গেলেন। স্ত্রীর স্ত্রী বাইরে বাবার জন্য শালটা নিতে আবার ভেতরে ঢুকে তাঁকে নিঃশাড়ে স্ত্রীর চামড়া ঢাকা বোলনার জয়ে থাকতে বেখে বেন বিখাল করতে পারল না। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল, ঐ নিজের কিছু একটা হয়েছে। একবার ভাবলও, তাঁকে লেকখা মিডাল

করবে, সে বে তাঁর খুবই অহরত। কিন্তু অত কি ভেবে পছন্দ করতে করতে
থর ছেড়ে চলে গেল, প্রতিবেশী মহিলাটির সঙ্গে উৎসব দেখতে।

সন্কেটিনের ঘুম ভাল হল না, ছটকট করলেন, ঘুম ভাঙল হুত্থা নিয়ে।
স্যাণ্ডেল খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু কাঁটাটার হাত হিতে পারেন নি। পা-টা
বেশ ফুলে উঠেছে। তাঁর স্ত্রী আজ সকালে আর ভেয়ন বড়াইট করছে না।

সন্ধ্যাবেলায় যে সময় শহর জুড়ে তার খানীর কথা শুনেছে। তাহলে
সত্যিসত্যিই একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়, বার কলে সবাই এত উজ্জ্বলিত হয়ে
উঠেছে। তিনি যে আত্ম একটা পাশী বোকার দলকে ঠেকিয়ে রেখেছিল,
সেটা অবশ্য তার বাখার কিছুতেই জায়গা পাচ্ছিল না। ও নয়, তার খারখা।
ওর প্রেরণাণে একটা আত্ম সভাকে ধরে রাখা, হ্যা, সেটা ও পারে। কিন্তু
একদল বোঝাকে নয়। তাহলে হয়েচেটা কী?

সে এত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যে ওর জন্য ছাপলের দুখ তাঁর আয়গার
নিয়ে গিয়ে হাজির হল।

তিনি উঠবার কোনো কারণ পেলেন না।

“বাইরে যাবে না?” তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

“ইচ্ছে নেই”, বক্তার দিয়ে উঠলেন।

স্ত্রীর মিনীত প্রেরণে এরকম উত্তর কেউ দেয় না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভাবল, তিনি
বোধহয় লোকের সারনা সারনি হওয়াটা এড়িয়ে বেতে চান, তাই উত্তরটা
প্রাছ করল না।

সকালের দিকেই লোকজন আসতে শুধু করল।

কয়েকজন জোরান হোকরা, বড়লোক বাপ-মায়ের ছেলে সব, এরাই
সাধারণত তাঁর আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে। এরা সব সময়ে তাঁকে তাঁদের
শিক্ষক বলে মানে, বখন তিনি ওদের কিছু একটা বলতেন, তখন তো কেউ
কেউ টুকেও নিত, বেন বিশেষ কোনো কথা।

আজ ওরা এসেই বলতে শুরু করল, এখেল তাঁর প্রশংসায় পঞ্চদ্ব।
কিন্নসকীর পক্ষে নাকি এটা একটা ঐতিহাসিক তারিখ (তাহলে সে তো
দ্রিকই য়েছিল, কথাটা কিলারসকী ছাড়া অত কিছু নয়)। সন্কেটিন নাকি
মেথিরে দিয়েছেন, মহান ধৃষ্টিবানরা বিশাল কর্মীও হতে পারে।

সন্কেটিন তাঁর বক্তাব লিখ তায়াশা ফুলে ওদের কথা শুনলেন। ওর বখন
কথা বলছিল, তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, বেন অনেক হুরের শব শুনছেন, নোকে

যেমন বহুব্রের বাড়ির শব্দ শোনে, একটা ভয়ঙ্কর অট্টহাসি, একটা আত্ম নহরের অট্টহাসি, ই্যা সারা দেশের, অনেক ঘরে, তবে এগিয়ে আসছে, অগ্রতিবৃত্ত ভাবে এগিয়ে আসছে, সকলের মধ্যে তার হোঁচকার লাগছে, পথচারীদের, বাজারের ব্যবসায়ী আর রাজনীতিবিদদের, ছোট ছোট হোকানের সব কর্মচারীদের।

“তোমরা যা বলছ, সব বাজে কথা”, বললেন তিনি হঠাৎ কি ছির করে।
“আমি কিছুই করি নি।

যুক্তি হলে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর একজন বলল :

“ঠিক এই কথাই আমরা বলাবলি করছিলাম। আমরা জানতাম তুমি এই রকমই বলবে। হঠাৎ এত হৈচৈ কেন, ফুলের সামনে জিজ্ঞেস করছিলাম অরসোপুসোসকে। দশ বছর সেক্রেটিস বিশাল চিন্তাধারা প্রকাশ করেছে, অথচ একটা লোকও তার দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। এখন সে একটা বুড়ে দিতেছে, ওমনি সমস্ত এখেল তার কথা বলছে। তোমরা বুঝতে পারছ না, কী লজ্জার কথা এটা? আমরা বলেছি।’

সেক্রেটিস একটা শব্দ করলেন।

“কিন্তু আমি তো আদৌ বুড় জিতিনি। আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম, তাই নিজেকে রক্ষা করেছি। এই বুড়ের ব্যাপারে আমার কোনো উৎসাহ ছিল না। আমি অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করি না, কিংবা আমার এখানে কোথাও আঙুরের কেতও নেই। কিজন্য আমি বুড় করব, তাই আমি জানতাম না। শহরতলির শুভবুদ্ধি লোকেরের মধ্যে আমি থাকি, বুড়ের ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসাহ নেই, ওরা যা করত আমিও ঠিক তাই করেছি, বড়জোর ওদের চেয়ে কয়েক সুদূরত আগে করেছি।”

ওদের তখন একেবারে হতভম্ব অবস্থা।

“ওকথা ঠিক নয়”, ওরা চিৎকার করে উঠল, “সেকথা আমরাও বলেছিলাম। তিনি আশ্চর্য্য করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। বুড়ে কেতার নিজস্ব ধরণ ওটা তাঁর। অজ্ঞমতি দাঁও, আমরা আবার ফুলে ছুটে বাই। এই প্রসঙ্গে একটা আলোচনা বহনিত রেখে এসেছি, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে বাবার জন্য।”

তারপর ওরা চলে গেল, সরবে গভীর আলোচনা করতে করতে।

কল্পই-এ ভর দিয়ে সেক্রেটিস শুয়ে রইলেন, আর ঘোঁরাই কালো হয়ে যাওয়া ছাত্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর পাশতাই তাহলে ঠিক।

তার দ্বী ঘরের কোণ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করছিল। ঘরের বত যে একটি পোশাক রিগু করে চলছে।

হঠাৎ চাপা পলায় জিজ্ঞাসা করল : “তাহলে আসল ব্যাপারটা কী ?”

তিনি চমকে উঠলেন। অনিশ্চিত ভাবে দ্বীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

কবরাস্তা একটা হাল্ফ, বুকটা একটা তক্তার বত, চোখদুটো বিষর। তিনি জানেন, ওর ওপর ভরসা করা যায়। যদি কখনো তাঁর ছাত্ররা বলে বলে— সজেক্টিস ? সেই অপদার্থ দুটিটা না, যে দৈবদের অস্বীকার করে ? তখন ও তাঁর পক্ষ নেবে। ওর দুর্ভাগ্য তাই তাঁর ঘরে এসে পড়েছে, তবে সেজন্য তার নালিশ নেই, একমাত্র তাঁর কাছে ছাড়া। বড়লোক ছাত্রদের বাড়ী থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থার কিরে তাঁর জন্য রাখা এক টুকরো রুটি আর চবির অভাব তিনি কোনো রাতে টের পাননি।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, ওকে সব বলা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু তারপরই তাঁর মনে পড়ল, এর পর যখন লোকজন সব আসবে, এটমাত্র যেমন এসেছিল, আর তাঁর বীরত্বের কথা বলবে, তখন ওর সামনে পাদা পাদা অসত্য কথা বলতে হবে আর ধোঁকাবাজি করতে হবে, ও প্রকৃত ঘটনা জানলে আর তিনি তা পারবেন না, কারণ ওকে তিনি ভয় পান।

তাই তিনি ওর মধ্যে গেলেন না, শুধু বললেন, “কাল রাতের ঠাণ্ডা হঠরত্টিটির দ্বাপের পক্ষে সমস্ত ঘটনা ভরে উঠেছে।”

তাঁর দ্বী কেবল তাঁর দিকে আবার অবস্থানের দৃষ্টিতে তাকাল।

খাবার কলে দেবার বত অবস্থা তাঁদের অবস্থাই ছিলনা। তিনি শুধু চোঁটা করলেন, ওকে অন্য চিন্তার ফেলতে। তাঁর দ্বীর বিশ্বাস দৃঢ় চল, একটা কোনো গণ্ডোগোল তিনি করে বলে আছেন। বিছানা চেড়ে উঠছেন না কেন ? তিনি চিরকালই বেরীতে বিছানা থেকে ওঠেন, তবে সে তো বেরী করে শুতে বান বলে। পড়কাল বেশ সকাল সকালই শুরুছেন। আর আজ সমস্ত শহর উঠে দাঁড়িয়েছে বিজয় উৎসব করতে। গলির সব দোকান পাট বন্ধ। শত্রুদের পেছন পেছন যে বোড়সওয়ারের দল গেলছিল তাদের কিছু আজ ভোর পাঁচটার সময় কিরে এসেছে, তাদের বোড়ার কুরের শব্দ শোনা গেছে। হাল্ফের ভিড় তাঁর ঘুবই পছন্দ। এমন সব দিনে তিনি সকাল থেকে রাত অবধি ঘুরে বেড়ান আর আলোচনা জুড়ে দেন। তাহলে বিছানা ছাড়ছেন না কেন ?

দরজা অন্ধকার হয়ে উঠল, চারজন লোক এসে চুকল শালকদের তরকের । ওরা ঘরের মধ্যখানে এসে দাঁড়াল, তাদের ওপর তার পড়েছে সজেটলকে আরেওপাপ-এ নিয়ে বাবার । সেনাপতি আলকিবিসাডেল নিজে আবেশ দিয়েছেন, হুড়ে তার বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য তাঁকে সর্বনা জানাবার আরোজন করতে ।

পলিতে একটা গুজন ওঠাতে বোকা গেল, প্রতিবেশীরা সবাই এসে বাড়ীর নামনে জড়ো হয়েছে ।

সজেটল টের পেলেন, তার নাম স্বরছে । তিনি জানেন, এবার তাঁকে উঠতে হবে, আর সঙ্গে যাওয়াটার অসম্মতি জানাতে হলেও অসম্মত দাঁড়িয়ে ছু-চারটে নম্র কথা বলে গুহের দরজা অবধি এগিয়ে দিতে হবে । কিন্তু তিনি জানেন, তিনি খুব বেশী হলে ছু-পা'র বেশী চলতে পারবেন না । তখন ওরা তাঁর পায়ের দিকে নজর দেবে, আর সব জানতে পারবে । আর সেট প্রচণ্ড অষ্টহাসি শুরু হয়ে যাবে, এইখানে এবং এখনি ।

তাই উঠে না দাঁড়িয়ে তার শক্ত বিছানার ওরে পড়ে বিরক্ত ভাবে বললেন :

“আবার সর্বনার দরকার নেই । আরেওপাপ-এ গিয়ে বল, কিছু বছর সঙ্গে এগারোটার সময় আমার দেখা করবার কথা, তাদের সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে বলব, সেটা আমদের কাছে জরুরী, আর সেইজন্য আমি বেতে পারছি না বলে ছুঃখিত । ওসব সজা-টতা আমার পছন্দ নয়, আমি অভ্যস্ত ক্লান্ত ।”

শেব কথাটা বোগ করলেন কারণ দর্শন শাস্ত্র টেনে থানার জন্য তাঁর বিরক্ত লাগছিল, আর প্রথম কথা বলার উদ্দেশ্য, অশালীন ব্যবহার করে সহজে রেহাই পাওয়ার আশা ।

শালকদের লোকেরা তো এ ভাবাও বোঝে । তারা গোড়ালিতে ডর দিয়ে ঘুরে চলে গেল, বাইরে বেশব লোক দাঁড়িয়ে ছিল তাদের পা দাঁড়িয়ে দিয়ে ।

“দরকারী লোকদের সঙ্গে ডর ব্যবহার করা তোমাকে ওরা শিখিয়ে দাফবে”, তার স্ত্রী বিরক্ত ভাবে রাসাঘরে গিয়ে চুকল ।

সজেটল ওর চলে যাওয়া পর্বত অপেক্ষা করলেন, তারপর তাঁর ভারী দেহটা বিছানার ওপর চট করে ঘুরিয়ে বসলেন বিছানার ধারে, সবলময়ে

আঁকচোখে হরহাট দিকে নজর রেখে আর অভ্যস্ত সাবধানে আবহ পায়ের তর দিয়ে পাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কোনো আশা নেই।

ঘামে নেয়ে আবার বিছানার ওয়ে পড়লেন।

আবহট্টা কেটে গেল। একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পা-টা নাড়াচাড়া না করলে কিছুই টের পাননা প্রায়।

এবার এল তাঁর বন্ধু আন্ডিসথেনেস।

তার বোটা ওভারকোটটা খুলল না, বিছানার পায়ের দিকে পাঁড়িয়ে বলল, জোর করে একটুকুণ কাশল, সক্রিটিল-এর দিকে তাকিয়ে গলার কাছের খসখসে দাড়ি চুলকোতে থাকল।

“তুমি এখনো তরে? আমি ভেবেছিলাম, শুধু আনখিগের সঙ্গে দেখা হবে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠেছি বিশেষ করে তোমার খবর দেখার জন্য। খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল, তাই কাল আসতে পারিনি।”

“বোস”, সক্রিটিল এক কথার বললেন।

আন্ডিসথেনেস ঘরের কোণ থেকে একটা চেয়ার এনে বন্ধুর কাছে রইল।

“আজ সন্ধ্যায় আবার পড়ানো শুরু করব। আর কলে রাখার কোনো কারণ নেই।”

“না।”

“আমি অবশ্য ভাবছি, ওরা আসবে কিনা। আজ তো সব বিশাল ভোজ। তবে এখানে আসবার পথে কেস্টন বলে ছোকরাটার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে এখন বললাম, আজ অ্যালজাব্রা পড়ান, ও দেখলাম খুব খুশী। আমি বললাম, ও ইচ্ছা করলে হেলমেট পরে আসতে পারে। প্রটাপোরাস আর অন্য সকলে এখন জানবে, ওরা যুদ্ধের পরদিন আন্ডিসথেনেস-এর কাছে অ্যালজাব্রা শিখেছে, তখন ওরা রাগে ফেটে পড়বে।”

সক্রিটিল তাঁর ঘোলনায় আলগোছে ঘোল খাচ্ছিলেন, সেক্ষণ্য তিনি হাত দিয়ে একটু হেলানো দেয়ালে থাকা দিচ্ছিলেন। তাঁর কোলা কোলা চোখে তিনি বন্ধুকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

“আর কারো সাথে তোমার দেখা হয়েছে?”

“বহ লোকের সাথে।”

বেগড়ানো মেজাজে ছাফের দিকে তাকালেন সক্রিটিল। আন্ডিসথেনেসকে কি সব খুলে বলা যায়? ওর ব্যাপারে তিনি বলতে গেলে নিশ্চিত। তিনি

নিজে ছাত্র পড়িয়ে হাইনে নেননি কখনো, কাজেই আন্ডিসথেনেস-এর সঙ্গে সে ব্যাপারে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এই কঠিন সবভাটা ওর কাছে খুলে বলাই বোধহয় ঠিক হবে।

আন্ডিসথেনেস তার ছোট ছোট জুলজুলে চোখে কৌতূহল ভরে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল :

“দগিয়ারটা সবাইকে ডেকে বলে বেড়াচ্ছে, তুমি নিশ্চয় পালিয়ে গেছিলে, আর ঠিক বুঝতে না পেরে তুল পথে অর্থাৎ সাহনের দিকে গিয়ে পড়েছিলে। কিছু ভাল ছেলে সেক্ষেত্রে তাকে পেটাবে ঠিক করে কেনেছে।”

সক্রেটিস অস্বাভিকর বিষয়ের সাথে তার দিকে তাকালেন।

“বাজে কথা”, বললেন অসন্তুষ্ট ভাবে। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যদি এইভাবে চালিয়ে যান, তাহলে তাঁর বিরোধী পক্ষ তাঁর কি হাল করে ছাড়বে।

রাজে, ভোরের দিকে তিনি ভেবেছিলেন, পুরো ব্যাপারটাকে একটা এক্সপেরিয়েন্ট বলে চালান করে বলবেন, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, সকলের বিশ্বাসের দোড় কতদূর। “হুড়ি বছর আমি অলিভে-গলিতে শাস্তির কথা বলেছি, আর একটা গুজব মাত্র শুনেই আমায় নিজের ছাত্ররা আমাকে ভয়ঙ্কর এক বোকা ভাবছে”, ইত্যাদি, প্রভৃতি। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই বুঝে ভয়ী হওয়া চলত না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শাস্তিবাদের পক্ষে সমস্তটা এখন ঝারাপ। বুঝে দেয়ে গেলে ওপরওয়ালাবাও কিছুকালের জন্য শাস্তিবাদী হয়ে ওঠে; বুঝে জিত হলে নীচু শ্রেণীর লোকেরাও বুঝবাদী হয়ে ওঠে, অন্তত কিছু কালের জন্য, বর্তমান না তাদের খেরাল হয়, তাদের কাছে জয় আর পরাজয়ের মধ্যে তফাৎটা ভেদন বড় নয়। না, শাস্তির কথা বলে সুবিধা হবে না।

পলির ভেতর থেকে বোড়ার পায়ে আওয়াজ এল। বোড়সওয়াররা বাড়ীর সাবনে ঝাঁড়াল, আর ভেতরে ঢুকল টলমল পায়ে আলকিবিয়াডেস।

“নব্বার আন্ডিসথেনেস, দর্পনের কারবার কেমন চলছে? ওরা সবাই আত্মহারা”, উৎফুল্ল ভাবে বলল মলা চড়িয়ে। “আরওশাপ-এ ওরা তোমার উত্তর শুনে খেপে উঠেছে সক্রেটিস। মজা করবার জন্য তোমাকে বিজয়-যুদ্ধে পরানোর নির্দেশ তুলে নিয়ে তার সঙ্গে তোমাকে পকাশ বা বেত বাঁধবার নির্দেশ দিয়েছি। তাতে অবশ্য ওরা সবাই হুঙ্কার ওঠা তারা চায় না। কিন্তু, তোমাকে তো সঙ্গে যেতেই হবে। আমরা দুজনে মিলে যাব, পায়ে হেঁটে।”

সক্রেটিস দীর্ঘনিশ্বাস কেললেন। এই যুবক আলকিবিয়াডেস-এর সঙ্গে তাঁর বনে ভাল। হুজনে বসে অনেকবার একসঙ্গে বহু খেয়েছেন। তাঁর কাছে যে এসেছে, এটা আনন্দের কথা। এটা ঠিক যে আয়েওপাস-এর ইচ্ছার কলসই সে এখানে আসেনি। আর এই যে ইচ্ছাটা প্রকাশ করল, এটাও সম্মানজনক এবং এক্ষেত্রে সহযোগিতা করা উচিত।

অবশেষে দোলনার দোল খেতে খেতে সাবধানে বললেন, “তাড়াতাড়ি থাকে কড়ের, বাড়ী-ঘর উল্টে ফেলে। বল।”

আলকিবিয়াডেস হেসে একটা চেয়ার টেনে আনল। বলবার আগে হেঁবল, অ্যানথিলে রান্নাঘরের দরজার এসে দাঁড়িয়ে পোশাকে হাত বুছড়ে, তার দিকে একবার নজরটাে ফুঁকে বলল।

“তোমরা, দার্শনিকরা অদ্বুত লোক”, বলল একটুখানি অঁইষের সঙ্গে। “এখন হয়তো তোমার আবার দুঃখ হচ্ছে, আমাদের এই যুগে জেতবার জন্য সাহায্য করেছ বলে। মনে হচ্ছে আন্ডিসথেনেস তোমাকে ঘেঁষিয়ে দিয়েছে, খুব একটা যথেষ্ট কারণ এর পক্ষে নেই।”

“আমরা এ্যালজাভ্রা নিয়ে কথা বলছিলাম”, তাড়াতাড়ি বলে উঠল আন্ডিসথেনেস আর আবার কেশে উঠল।

আলকিবিয়াডেস এক গাল হাসল।

“অন্য কিছু আমি আশা করিনি। এসব ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করাটা শুধু ঠিক নয়। তাই না? এখন, আমার মতে এটা হচ্ছে প্রকৃত বীরত্ব। বলতে পার তেমন কিছু না, কিন্তু একমুঠো জলপাই পাতাই বা এমন কি বিশেষ বস্তু হতে পারে? দাঁত চেপে সহ্য কর, ব্যাপারটা চুকে থাক, বুঝলে বুড়ো। ঝটপট শেষ হয়ে যাবে, আর ব্যথাও পাবে না। তারপর আমরা বাব, এক পাত্তর টানতে।”

কৌতুহল ভরে তাকাল চওড়। শক্ত সমর্থ চেহারাটার দিকে, শুটা এখন বেশ জোরে দোল খাচ্ছে।

সক্রেটিস চট করে ডেবে নিলেন। তাঁর মাথার একটা বুদ্ধি এসেছে কি বলা যায়। তিনি বলতে পারেন, গতকাল রাত্রে কিবা আছ সকালে তাঁর পাঁচকে গেছে। বলা যায়, সৈন্যরা যখন তাঁকে তাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয় তখন। সেখানে একটা কথাও উঠবে। এই ঘটনার কলে জানা যাবে,

একজন নিজেকে লোককে সম্মান দেখাতে গিয়ে কত লজ্জা লোকে তার কতি করে বলে।

হোল খাওয়া না খাওয়ার শরনের দিকে তুঁকলেন, কলে খাড়া হয়ে বসতে পারলেন। ডান হাত দিয়ে খালি হাতটা ওপর থেকে নীচে বসতে বসতে বললেন বীরে হুঁহে :

“ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার পা...”

এই কথা বলবার সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাসা ঘরের দরজার জ্যানথিলের ওপর। তাঁর দৃষ্টি স্থির ছিল না, কারণ এইবার প্রথম এই প্রসঙ্গে সত্যিকারের বিধো কথা বলা হবে, এতক্ষণ তিনি শুধু চুপ করে ছিলেন।

লক্কেটস ভাষা হারিয়ে ফেললেন। একটা গল্প কাঁহবার সব ইচ্ছা তাঁর হঠাৎ উবে গেল। তাঁর পা মচকারনি।

হোলনা খেনে গেল।

“শোন আলকিব্রাডেল”, বললেন উৎসাহ ভরে এবং বেশ তাজা গলার, “এক্ষেত্রে বীরত্বের কথা শুঠে না। বুদ্ধ শুক হওয়া মাত্র, অর্থাৎ প্রথম পাশীকে দেখতে পেয়েই আমি তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেছি, এবং ঠিক দিকেই পালিয়েছি— পেছন দিকে। কিন্তু সেখানে একটা কাঁটা ছোপ ছিল। আমার পায়ে একটা কাঁটা বিঁধে যায়, কলে আর নড়তে পারি নি। তখন আমি পাগলের মত আমার চারপাশে তলোয়ার চালিয়েছি আর নিজেকেই কিছু লোককে প্রায় সাবাড় করে ফেলেছিলাম। বিশেষতঃ হয়ে আমি অন্য সব ব্যাটেলিয়ন-এর নাম নিয়ে হাঁক-ডাক করছিলাম, যাতে পাশীদের বিশ্বাস হয়, ওগুলো রয়েছে। ওটা অবশ্যই অবাস্তব ছিল, ওরা তো ঐক্য ভাষা জানে না। শুধিকে ওরা বেশ ভয় পেয়েছে বলে মনে হয়েছিল। ওরা বোধ হয় ঐ চিংকার লক্ষ করতে পারে নি, বিশেষ করে অতটা পথ এগিয়ে আসতে বত বজাট পোহাতে হয়েছে তারপর। ওরা এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর তখনই আমাদের বোড়লওয়াররা এসে হাজির হয়। এই হল আসল কথা।”

কয়েক সেকেন্ড ঘরের ভেতরটা নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আলকিব্রাডেল অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। আভিসথেনেস হুঁথের শরনে হাত নিয়ে কাশল, এবার এককথন বাতাবিক ভাবে। যেখানে জ্যানথিলে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই রাসাঘরের দরজার ওখান থেকে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি জেলে এল। তারপর আভিসথেনেস বলল নিরাসক্ত ভাবে :

“আর তাই তুমি স্বাভাবিক কারণেই কির-মুহুট নিতে দীর্ঘি ভেঙে ওপরে উঠে আরোওপাশ-এ যেতে পারনি। এবার বুঝলাম।”

আলকিবিরাতেল চেয়ারে হেলান দিয়ে বলে চোখ কুঁচকে হোলনার বলা হার্পনিককে কুঁচিয়ে দেখল। সকেটস তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন না, আন্ডিসথেনেসও না।

আলকিবিরাতেল আবার সামনে খুঁকে তাক দিয়ে সকেটস-এর একটা হাটু ভড়িয়ে ধরল। তার লম্বাটে কচি মুখ একটু কুঁচকে উঠল, কিন্তু তার চিন্তা বা মনের অবস্থা প্রকাশ পেল না।

“তুমি কেন বললে না, যে তুমি অন্য কোনো একটা আখ্যাত পেরেছ ?” জিজ্ঞাসা করল।

“কারণ কীটাটা আমার পায়ে বিঁধে আছে”, সকেটস বললেন কর্কশ স্বরে।

“ও, তাই ?” বলল আলকিবিরাতেল। “বুঝলাম।” তাকাতাকি উঠে দাড়িয়ে বিছানার কাছে গেল।

“আবার নিজের মুহুটটা লগে করে আনিমি বলে আকসোস হচ্ছে। ওটা আমার লোকটার হাতে দিয়ে এসেছি রেখে দেবার জন্য। নইলে ওটা আমি এখন তোমাকে দিয়ে যেতাম। তুমি বিশ্বাস করতে পার, আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহসী মনে করি। এমন কেউ আছে বলে জানিনা, যে তুমি বা বললে তা বলতো বর্তমান অবস্থায়।”

এবার সে তাকাতাকি বাইরে চলে গেল।

তারপর যখন জামখেজে পা-টা ধোবার সময় কীটাটা বার করল, তখন বলল বিরক্তভাবে :

“রক্ত বিধিরে উঠতে পারত।”

“অন্তত পকে”, বললেন হার্পনিক।



অমিত্যন্তকান্ধী স্তম্ভা

আমার ঠাকুরা যখন মারা গেলেন তখন আমার ঠাকুরমার বয়স বাহাত্তর বছর। বাতের এলাকার ছোট্ট একটা শহরে ঠাকুরার একটা ছোট মিথোগ্রাকীর কারখানা ছিল, সেখানে তিনি দু-তিনজন সহকারী নিয়ে নতুন অবধি কাজ করেছেন। আমার ঠাকুরমা কি ছাড়াই বাড়ীর কাজকর্ম চালিয়ে নিতেন, পুরোনো স্বরকরে বাড়ীটা বেগাভন। করতেন, আর লোকজন আর বাজাহের অভ্যাস করতেন।

ঠাকুরমা ছিলেন ছোট-খাট রোগাটে বহিলা, চোখদুটো ছিল বিরগিটির মত চকল, কিন্তু কথা বলবার ধরন ছিল ধীরে ধীরে। যে সাতটি সন্তানের কন্য তিনি নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে পাঁচজনকে বড় করে তুলেছিলেন বেশ অভাব অন্যতমের মধ্যে। তার কলকৌশলের সাথে সাথে আরো ছোট করে পড়েছিলেন।

সন্তানদের মধ্যে দুজন মেয়ে আমেরিকা চলে গেছিল, আর দুজন ছেলেও অন্যত্র চলে গেছিল। কেবল সবচেয়ে ছোট ছেলে, যার স্বাস্থ্য তেরন ভাল ছিল না, সে সেই শহরে রয়ে যায়। এই ছেলে বই ছাপার কাজ করত, আর তার পরিবারটিও ছিল গীতিমত বড়।

কাজেই আমার ঠাকুরমা মারা গেলে ঠাকুরমা বাড়ীতে একা পড়ে গেলেন।

তার কি হবে এই সবতা নিয়ে সন্তানরা চিঠি দিয়েছিল। একজন তার কাছে একটা থাকবার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল, বই ছাপার কাজ যে করত সে তার পরিবার নিয়ে তার কাছে এসে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধা সব প্রস্তাব নাকচ করে কেবল যেসব সন্তানের কথা ছিল তাদের কাছ থেকে সাহায্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে রাণী বলে জামিয়েছিলেন। মিথোগ্রাকীর কারখানাটা বেশ পুরোনো হয়ে গেছিল, ওটা বিক্রি করে বসতে গেলে কিছুই পাওয়া যাবনি, তাছাড়া বেগাও ছিল।

সন্তানরা তাঁকে লিখল, তিনি তো তাই বলে একবারে একা থাকতে

পারেন না, কিন্তু তিনি যখন দেখে কথার আশে কর্ণপাত করলেন বা তখন তারা হাসি ছেড়ে দিয়ে যানে যানে সাবাস্ত কিছু অর্থ পাঠাতে শুরু করল। তারা ভাবল, আর বাই হোক, বই ছাপে যে তাই সে তো সেই পছন্দই আছে।

ছোট ভাইটিও তার ভাইবোনদের কাছে তাদের মায়ের খবরাখবর দেবার ভার নিয়েছিল। আমার বাবার কাছে লেখা তার চিঠিগুলি আমি ঠাকুরদাকে কবর দেবার দু-বছর পরে একবার বেড়াতে এসে পাই। সেই দুই বছরে কি ঘটেছিল তার একটা আভাস আমি এই চিঠিগুলোতে পাই।

যবে হল, ঠাকুরদা তার ছোট ছেলেকে বেশ বড়সড় কাঁকা বাকিতে উঠে আনতে দিতে আপত্তি জানাবার কলে সে গ্রন্থর থেকেই হতান হয়েছিল। সে চারটি সন্ধান নিয়ে তিনটে ঘরে থাকত। কিন্তু সেই বুড়া কেবলমাত্র খুব আশা একটা সম্পর্ক রেখেছিলেন তার সঙ্গে। তিনি বাচ্চাদের প্রত্যেক রবিবার বিকেলে কফি খাবার নিয়ন্ত্রণ করতেন, বাস এই পর্যন্ত।

তিন বছরে চার থেকে আটবার তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করেছেন আর ছেলের ঐক্যে বছরের অন্য বেরী বানিয়ে রাখতে সাহায্য করতেন। তাদের ঐ ছোট বাড়ীতে জায়গার খুব অভাব, বুড়ার এলাতীর বসবাস লব্ধে বৌটি উল্লেখ করত। ছেলে তার খবরে সেকথা লিখতে গিয়ে আশ্চর্য প্রকাশ করতে বিধা করত না।

আমার বাবা একবার চিঠিতে জানতে চেয়েছিল, বুড়া তাহলে তখন কাঁ করতেন; তার উত্তরে সাবাস্ত কথার লিখেছিল, তিনি নাকি সিনেমা দেখতে যান।

একখাটা বানতেই হবে, এটা ঠিক আভাবিক নয়, বিশেষ করে তাঁর সন্ধানদের গোঁথে। তিন বছর আগের সিনেমা আককের মত ছিল না। সেগুলো ছিল মোংরা, শুকোট ঘর, প্রায়ই একটা স্টিউস খেলার জায়গার, চোকবার মুখে বিশাল বিশাল পোস্টার, তাতে খুন আর আবেগ বোঝা করা হতো মোজারে। প্রকৃতপক্ষে অপরিণত বয়সের লোকেরা যেত আর বেতগ্রেবিক-গ্রেবিকরা, ভেতরটা অন্ধকার বলে। একা একজন বুড়া সেখানে বোনান।

আমার এই সিনেমার বাবার অন্য দিকটাও ভেবে দেখবার মত। টিকিটের দাম অবশ্যই কম ছিল, কিন্তু যেহেতু সেই প্রয়োগ ভ্রমার্মার বেশ নিচে ছিল, সেই হেতু ওটা “জলে কেলা পরনা” বলে গণ্য হতো। আর অর্থ জমাগুলি যেওনা ভেবন ভাল কাল নয়।

আমার ঠাকুরমা যে সেই শহরে তাঁর ছেলের সঙ্গের শুশ্রূষিত দেখা সাফল্য করতেন না তা নয়, অন্য কোনো পরিচিতির কাছেও যেতেন না বা তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন না। সেই শহরে সবাই বেচারে একসঙ্গে বসে কফি খায়, সেখানে তিনি কখনো যেতেন না। তাঁর বদলে তিনি প্রায়ই এক হুঁচির কারখানায় যেতেন, এক বস্তি এলাকায়, আর সেই গলিটার একটা বদমাশও ছিল। সেখানে, বিশেষ করে বিকেলের দিকে খেলব লোকেরা আজ্ঞা দিত তারা তেমন সন্তোষ কেউ ছিল না। তাঁটিখানার বেকার সেরেবাহুব আর দিনবজুর সব। হুঁচিটা ছিল মধ্যবরসী, সে সারা জুনিয়া ঘুরে এসেছে তবে তাঁর কলে কিছু কাজের কাজ হয়নি। লোকে বলে, সে মধ্যপও ছিল। আমার ঠাকুরমার পক্ষে লোকটা আর বাই হোক কোনো সম্পর্ক রাখবার মত কেউ ছিল না।

একটা চিঠিতে ছোট ছেলে আভাস দিয়েছিল যে সে তাঁর মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে রীতিমত নিরাসক্ত উত্তর পেয়েছে। "লোকটা অনেক বেখেছে", এই ছিল তাঁর উত্তর, আর সেই আলোচনার সেখানেই ইতি। ঠাকুরমা যে ব্যাপারে কথা বলতে চাইতেন না, সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা সহজ ছিল না।

ঠাকুরমা হারা বাবার প্রায় মাস ছয়েক পর ছোট ছেলে আমার বাবাকে লেখে, ঠাকুরমা নাকি একদিন অন্তর হোটেলে খান।

এ আমার কোন দেশী খবর !

ঠাকুরমা, যিনি সারা জীবন এক ডজন লোকের জন্য রান্না করেছেন আর সবলময়ে কেবল উষ্ণ খাবা খেয়ে এসেছেন, তিনি এখন হোটেলে খান ! তাঁর হয়েছে কী ?

তাঁর কিছুদিন পরেই আমার বাবা অকিসের কাজে ঐ শহরের কাছাকাছি একটা আরণ্য গেছিল, তখন মায়ের সঙ্গে দেখা করে।

ঠাকুরমা তখন বাইরে বাবার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি টুপিটা আবার খুলে রাখেন আর বাবাকে কিছুট আর রোড ওয়াইন খেতে দেন। তাঁর মেজাজ মোটাভুটি ভালই বলে হয়েছিল, খুব উজ্জ্বলিত নয় আমার তেমন গভীরও নয়। আমাদের সকলের খবর নিলেন, তবে তেমন খুঁটিয়ে নয়, বিশেষ করে জানতে চাইলেন, বাচ্চাদের কাজ চেরি কল পাওয়া যায় কিনা। ওটা ওঁর বরাবরের স্বভাব। দরুটা অব্যক্ত সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, আর তাঁকে বেখে হুঁই বলে হয়েছিল।

* তাঁর এই বন্ধন জীবনের একটা ব্যাপার বোঝা গেলছিল। তিনি আমার বাবার সঙ্গে গোরহানে তাঁর খারীর সরাশি বেথতে যেতে চাননি। “তুই একাই যেতে পারবি”, বলেছিলেন কথা প্রসঙ্গে, “এখন সারিতে বাঁহিকের তৃতীর কবরটা। আমাকে একটা জায়গায় বেতে হবে।”

ছোট ছেলে পরে ব্যাখ্যা করে বলেছিল, খুব সম্ভব সেই মূর্তির ওখানে গেছিলেন। সে অনেক অভিযোগ করেছিল।

“আমি ভীতভয় এই পর্কের মধ্যে পড়ে আছি, কাজ করি পাঁচ ঘণ্টা, তাও জন্মা বজুরীতে, সেইসঙ্গে আমার ইশাদিও কামেলা করছে, ওহিকে বড় রাস্তার ওপর বাড়ীটা কাঁকা পড়ে আছে।”

আমার বাবা হোটেলের একটা ঘর নিয়ে ছিল, তবে আশা করেছিল, তাঁর মা তাকে তাঁর কাছে থাকতে বলবেন, অল্পত সুখের কথা, কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে কোনো কথাই বলেন নি। কিন্তু যখন ঐ বাড়ী বোকাই লোক থাকত, তখন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে না থেকে হোটেলের পেছনে খরচা করার ব্যাপারে তাঁর বরাবর আপত্তি ছিল!

কিন্তু যখন হল তিনি সাংসারিক জীবনকে ছুটি দিয়েছেন, এখন যখন তাঁর জীবন শেষ হয়ে এসেছে তখন নতুন পথে যেতে চান। আমার বাবার যথেষ্ট পরিমাণ উদারতা ছিল, এবং তাঁকে “সম্পূর্ণ সচেতন” বলেই মনে নিয়েছিলেন, আর আমার কাকাকে বলেছিলেন, বুঝাটিকে তাঁর ইচ্ছা মত চলতে দিতে।

কিন্তু তিনি কী চাইতেন?

তারপর যে খবর পাওয়া গেলছিল, তা হচ্ছে, তিনি একটা গাড়ী ভাড়া করেছিলেন, এক বৃহস্পতিবার এক জায়গায় বেড়াতে বাবার জন্ত। ও রকম একটা গাড়ীতে আত্ম একটা পরিবারের জায়গা হয়, সেটার চাকাগুলো বিশাল বিশাল এবং বোড়ায় টানে ওলব গাড়ী। যখন আমরা সব স্নান-স্নানদীরা বেড়াতে আসতাম, তখন ঠাকুরবা কবরটিও ওরকম গাড়ী ভাড়া করতেন। ঠাকুরবা সকলমতে গাড়ীতে থেকে যেতেন। যেতে হাও গোছের হাত নেড়ে সঙ্গে বাঙরা এড়িয়ে গেছেন।

তারপর, ঐ গাড়ী করে বেড়াতে বাবার পর, গেলেন একটা শহরে, এক বড় গাঁয়ের শহরে, যেখানে যেতে ছুঁশটী মাপে। সেখানে বোড়দৌড় ছিল, এবং আমার ঠাকুরবা সেই বোড়দৌড়ে গেলেন।

ছোট ছেলে এবার রীতিমতভাবে শরিত হয়ে উঠল। সে একজন ডাক্তার

নিরে বেতে চেয়েছিল। সেই চিঠি পড়ে আমার বাবা মাথা বেড়েছিল, তবে ভাতার নিরে খাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছিল।

সেই বছরে ঠাকুরবা একা বান বি। সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন একটা বেয়াকে, ছোট ছেলে লিখেছিল, একটা প্রাণ হাবাগোবা বেতে, ঠাকুরবা যে হোটেলের খেতেন একদিন অন্তর, সেই হোটেলের রান্ধুনী ছিল সে।

এরপর থেকে এই “হাবাগোবা” একটা কুনিকা নিরেছিল।

ওর ব্যাপারে আমার ঠাকুরবার একটা অল্প দুর্বলতার স্মৃতি হয়েছিল। তিনি ওকে নিয়ে সিনেমার বেতেন, হুচিটার ওখানে নিরে বেতেন। জানা গেছিল, লোকটা লোভান ডেমোক্যাট, তা ছাড়া গুজব শোনা গেছিল, এই দুই মহিলা রান্ধায়ে একটা রেন্ট ওয়াইন নিরে এসে তাস খেলত।

“বা এই হাবাগোবাটাকে একটা টুপি কিনে নিরেছে, তার ওপর গোলাপ বসানো”, ছোট ছেলে লিখেছিল বিশেষরো হয়ে। “এদিকে আমাদের আমার কনুনিরমে বাবার পোশাক নেই।”

আমার কাকার চিঠিগুলো প্রমাণের স্বত হয়ে উঠেছিল, সেসব চিঠিতে থাকত কেবল “আমাদের প্রিয় বাবের অন্তর কাকের” খবর, তাছাড়া আর কিছুই থাকত না। বাকিটা আমার বাবার কাছে শোনা।

হোটেলের মালিক বাবাকে চোখ টিপে বিভবিভ করে বলেছিল, “ক্রাউ বে. এখন বা হোক একটু কুতি করে নিম্মেন, সেরকমই শোনা যাচ্ছে।”

প্রকৃত পক্ষে আমার ঠাকুরবা এই শেষ বছর কটাও কিছু কোনোক্রমেই বিলাসিতার মধ্যে কাটাননি। হোটেলের না খেলে তিনি বেশীর ভাগ দিনই সামান্য একটু ডিম দিয়ে তৈরী খাদ শুধু খেতেন, একটু ককি, আর সব কিছু বাহ দিলেও তাঁর প্রিয় কিছুট। সেই সঙ্গে তিনি সস্তা দামের রেন্ট ওয়াইন কিনতেন, আর প্রত্যেকবার খাওয়ার পর তার থেকে ছোট্ট এক গ্রাস খেতেন। বাড়িটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছিলেন, শুধু শোবার ঘর আর রান্ধাঘরট না, ও দুটোই তিনি ব্যবহার করতেন। বা হোক, তাঁর সন্তানদের না জানিয়ে তিনি বাড়ি বন্ধক দি়েছিলেন। কখনো জানা যায় নি, সেই অর্থ দিয়ে তিনি কি করেছিলেন। তবে হয় তিনি তা সেই মুহুর্তে দি়েছিলেন। তাঁর বৃত্তার পর সে অল্প একটা বছরে চলে যায়, আর সেখানে বাকি সে অর্ডারী স্মৃতি বানাবার একটা বেশ বড় কারবার খুজেছিল।

তাল করে ডেবে দেখলে বোঝা যাবে তিনি পরপর দুটো জীবন বাসন

করেছেন। প্রথমটা, বেয়ে, দ্বী আর মায়ের জীবন, আর বিতীর্ষটা একে
ফ্রাউ বে. হিসেবে। ফ্রাউ বে., একজন একা লোক, কোনো দায়িত্ব নেই,
আছে সারাক্ষণ হলেও কখনো আর্থিক সারথ্য। প্রথম জীবনটার প্রায় ছয় দশক
সবর কেটেছে, বিতীর্ষটার দুবছরের বেশি নয়।

আমার বাবা জানতে পেরেছিল, তিনি শেষ ছয়দশক বিশেষভাবে স্বাধীনতাকে
প্রদর্শন দিয়েছিলেন, যা সাধারণ লোকে ভাবতেও পারে না। বেরল ঐশ্বর্যকালে
রাত তিনটের সময় খুব থেকে উঠে কাকা রাস্তায় বেড়াতে যেতেন, ঐ ছোট
শহরে ঐ সময়ে তিনি একাই থাকতেন পথে। আর, বুড়া মহিলা বলে যে
পাত্রী তাঁকে সব দিতে তাঁর কাছে আসত, তাকে নাকি তিনি লিনেমার বাবার
জন্য নিষ্পত্তি করেছিলেন, লোকের তাই ধারণা।

তিনি কিছু কোনোক্রমেই একলা ছিলেন না। ঘূটিয়ার ওখানে মনে হয়
প্রচুর মজার লোকের দাতারাত ছিল, আর সেখানে গল্পও হত প্রচুর।
সেখানে তাঁর নিজের কেনা এক বোতল রেড ওয়াইন সব সময়ে মজুত থাকত,
তার থেকে তিনি ছোট্ট এক গ্লাস খেতেন, ওদিকে অন্যেরা গল্প করত আর
শহরের নারী কঠাব্যক্তির নিয়ে মজরা করত। এই রেড ওয়াইন তাঁর জন্য
সিদ্ধান্ত করা থাকত, তবে সাধীদের জন্য মাঝে মধ্যে কড়া জাতের মদ নিয়ে
খেতেন।

কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে হেমন্তের এক বিকেলে তিনি তাঁর শোবার
ঘরে মারা বান, তবে বিছানার ত্তরে নয়, জানালার ধারে কাঠের চেয়ারে বসে।
তিনি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় লিনেমার বাবার জন্য সেই “হাবাগোবাকে” নিষ্পত্তি
করেছিলেন, আর তাই তাঁর মৃত্যুর সময়ে সেই মেয়েটা পাশে ছিল। তাঁর
বয়স তখন চরাস্তর বছর।

তাঁর মৃত্যু শব্দ্যার তোলা কটো তাঁর নাতি-নাতনীদেব জন্য তুলে রাখা
হয়েছিল, আমি সে কটো দেখেছি।

একটা ছোট্ট মূখ, তাতে প্রচুর তাঁজ পড়েছে চামড়ার, আর ঠোট দুটো
পাতলা ভবে মুখের দাঁ বেশ বড়। বেশ ছোট ভবে ছোট অন্তঃকরণের নয়।
তিনি দীর্ঘকাল ক্রিয়ের জীবন আর সামান্য কবিতা স্বাধীনতা ভোগ করেছেন,
আর জীবনের ক্রটি, ঠিকোঁটুকু বাধা দিয়ে, সবটুকু স্বয়ং করেছেন।



হেরার কল্পনার-এক কাহিনী

হেরার কল্পনার এবং প্রকৃতি

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করলে হেরার কল্পনার বলেছিলেন, “আমি মাঝে মধ্যে বাড়ির বাইরে গিয়ে তু-চারটে গাছ দেখতাম। বিশেষ করে দিনের এবং রাত্তির মধ্যে সায়ন্তর রেখে অস্তরকর দেখার আব প্রকৃত একটা অবস্থার পরিণত হয় বলে। কালে কালে শতরঙলোর মধ্যেও আমরা বিশেষ্যারা হয়ে পড়ি, দেখি শুধুই প্রয়োজনীয় বস্তু সব, বাড়ি আর পথ, কেউ থাকে না, কীকা কিছা ব্যবচাষ করে না কেউ, অপ্রয়োজনীয় হতে পাবত। আমাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থাতো মাহুযকেও এক ভাতীর প্রয়োজনীয় বস্তু বলে গণ্য করে, আর সেইজন্যই গাছেরা অস্তুত আমার কাছে প্রশান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমার তরফ থেকে উপেক্ষিত, কারণ আমি কাঠ-মিস্ত্রী নই, এমনকি আমি আশা করি, কাঠ-মিস্ত্রীদের ব্যাপাবেও ওগুলোই মধ্যে কিছু আছে যার মূল্যায়ন সম্ভব নয়।”

(হেরার ক. আবে বলেছিলেন, “আমাদের দরকার প্রকৃতিকে বখালস্তুব কম ব্যবহার করা। বিনা কাজে প্রকৃতির মধ্যে সময় কাটালে সহজেই অস্তুব অবস্থার পড়তে হয়, আর জাতের কিছু হতে পাবে লোকের।)

সুব্যবস্থা

হেরার ক. একবার বলেছিলেন, “চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়া আলো ব্যবহার করে, চিন্তা করিয়া খাত গ্রহণ করে এবং চিন্তা করিয়া চিন্তা করে।”

আকার এবং উপাদান

হেরার ক. একটি ছবি দেখছিলেন, ছবিটাতে বেশ কিছু ইম্মারত আকৃতি ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “কিছু শিল্পী আছে, ছবিরাটা দেখবার সময় তাদের অবস্থা বহু দার্শনিকের মত হয়। আকার নিয়ে এমন

ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে উপাদানটাই হারিয়ে যায়। আমি একবার এক রাস্তার
 ওখানে কাজ করেছিলাম। সে আমার হাতে গাছ-কাটা একটা কাঁচি দিয়ে
 লরল গাছ ইটিতে বলেছিল। গাছটা ছিল "একটা টবে আর কোন এক
 উৎসবের জন্য দেবার কথা ছিল। সেজন্য গাছটার আকৃতি বলের মত গোল
 হওয়া বরকার ছিল। আমি সাথে সাথে লেগে গেলার সেই ছয়ছাত্তা গাছটা
 ইটিতে, কিন্তু বহুক্ষণ ধরে শত চেষ্টা করেও ওটাকে গোল আকৃতি দিয়ে উঠতে
 পারিনি। একবার এপাশে, অন্যবার ওপাশে বেশি ছোট্ট কেলছিলাম। অবশেষে
 যখন ওটা একটা বলের আকৃতি পেল, বলটা বড় ছোট হয়ে গেছে তখন।"
 মালী হতাশ হয়ে বলেছিল, "বশ, এটা একটা বল, কিন্তু লরলটা গেল
 কোথায়?"

বদ্ধকৃত্য

বদ্ধকে সাহায্য করবার প্রকৃত উপায় হিসেবে হেরার ক. এই উদাহরণের
 গল্পটি বলেন। একজন বদ্ধ আরব-এর কাছে তিনজন যুবক এসে বলে,
 "আমাদের বাবা মারা গেছেন। তিনি আমাদের জন্য সত্তেরোটা উট রেখে
 গেছেন, আর একটা উইল করে গেছেন। সেট অতুল্যে আমাদের মধ্যে
 সবচেয়ে বড় জন অর্ধেক, দ্বিতীয় জন এক তৃতীয়াংশ আর সবচেয়ে ছোট জন
 নয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এখন আমরা এই ভাগভাগি ব্যাপারে একমত
 হতে পারছি না। তুমি এর ভার নাও।" আরবটি একটু ভেবে বলল, "বা
 দেখছি, সহজে ভাগ করতে গিয়ে তোমাদের একটা উট কম পড়ছে। আমার
 নিজের একটিমাত্র উট আছে, তবে সেটা তোমরা নিতে পার। ওটা নিয়ে
 বাও, আর তারপর ভাগভাগি করে নাও, তারপর বা উদ্ধৃত থাকবে, আমাকে
 কেন্দ্র দিয়ে বেও।" ওরা এই বদ্ধকৃত্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উটটা নিয়ে
 গেল। তারপর আঠারোটা উট এমন ভাগ করল যে, সবচেয়ে বড় জন
 অর্ধেক, অর্থাৎ নয়টা, দ্বিতীয় জন এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ছয়টা, আর সবচেয়ে
 ছোট জন নয় ভাগের একভাগ, অর্থাৎ দুটো উট পেল। বার বার উট সরিয়ে
 দেবার পর অবাক হয়ে দেখল, একটা উট উদ্ধৃত হয়ে গেছে। সেটাকে ওরা
 অধের বুদ্ধ বদ্ধর কাছে কেন্দ্র নিয়ে এসে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।
 হেরার ক. এই বদ্ধকৃত্যকে উপবৃত্ত বললেন, কারণ এতে কারো বিশেষ কোনো
 ক্ষতি হয় নি।

(আরব : সেক্সত চকবর্তী)

নির্ভরযোগ্যতা

বাহুবল পরশুরের প্রতি আচরণের মধ্যে নিরন-পৃথলার পক্ষে ছিলেন হেয়ার ক, কলে তাঁকে সারা জীবন অনেক কতাতের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। একবার তিনি আবার এক অবততিকর অবহার পড়েছিলেন। দেবার একই রাতে শহরের মধ্যে বহু দূরে দূরের আরণার বাবার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি তখন অস্থ ছিলেন বলে তাঁর এক বন্ধুর ওভারকোটটা চেয়েছিলেন। বন্ধুটি সেটা দিতে রাজী হয়েছিল, যদিও সেজন্য তাকে একটা সামান্য কাজ মূলতবী রাখতে হয়। সন্ধ্যার দিকে হেয়ার ক-এর এমন দুঃখবহা হয়ে উঠেছিল যে ঐসব বাতারাভ আর তাঁর কোনো উপকারে আসবে না, বরং সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজন দেখা দিল। তবুও, সময়ের অভাব সত্ত্বেও হেয়ার ক, তাড়াতাড়ি করে ঠিক সময়মত ওভারকোটটা নিয়ে এসেছিলেন, যদিও সেটা তখন আর তাঁর কোনো কাজে লাগবে না, আর সেটা করেছিলেন, তাঁর দেয়া কথাটা রাখবার জন্য।

সেই বেচারী ছেলে

হেয়ার ক, নির্ভর আচরণের কথা বলছিলেন। অন্যায়ের কল সম্পূর্ণ নীরবে তেডরটার জলে। তিনি এই কাহিনী বলেন—“সামনে দি়ে একটা ছেলেকে কীভাবে কীভাবে বেতে বেখে একজন তাকে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করে। ‘সিমেসার বাব বলে আমি ছটো দশ কেনী বোপাড় করেছিলার’, বলল সেই ছেলেটি, ‘তখন একটা বড় ছেলে এসে জোর করে আমার হাত থেকে একটা কেড়ে নিয়েছে’, এই বলে সে একটু দূরের একজনকে দেখাল, তাকে তখনো দেখা যাচ্ছে। ‘তুই চিংকার করিস নি?’ লোকটা জিজ্ঞাসা করল। ‘করেছিলার তো’, বলে ছেলেটা আরো বেশী কৌপাতে গুরু করল। ‘কেউ ওলতে পারিস তোর চিংকার?’ লোকটা তাকে আরো জিজ্ঞাসা করল, সেই সঙ্গে আদর করে তার পায়ে হাত বোলাতে থাকল। কৌপাতে কৌপাতে ছেলেটা বলল, ‘না।’ ‘তুই আরো জোর চিংকার করতে পারিস না?’ লোকটা আনতে চাইল। ‘তাহলে ওটাও দি়ে দে।’ তার হাত থেকে শেষ দশ কেনীটা দি়ে নির্ভিতে চলে গেল।”

প্রথম, ঈশ্বর আছেন কিনা

হেয়ার ক.-কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর আছেন কিনা। হেয়ার ক. বলেছিলেন, "একটা অহরোধ করছি, ডেবে দেখ, এই প্রশ্নের উত্তর গুনলে তোমার ধারণার পরিবর্তন হবে কিনা। যদি পরিবর্তন না হয়, তাহলে আমরা এই প্রশ্ন উপেক্ষা করতে পারি। যদি পরিবর্তন হয়, তাহলে আমি তোমাকে অন্তত একটা কথা বলে সাহায্য করতে পারি, তুমি নিজেই ঠিক করে কেলেক— তোমার একটা ঈশ্বর হরকার।"

আলোচনা

"আমরা আর পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলতে পারছি না" হেয়ার ক. বললেন একজনকে। চমকে উঠে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "কেন?" "আপনার সামনে আমি তেমন ভাল কিছু বলতে পারি না", আকসোস করলেন হেয়ার ক.। "আরে তাতে আমার কিছুই বায় আসে না", সাফল্য দিয়ে বললেন অন্যজন। —"তা জানি", বললেন হেয়ার ক. বিরক্ত ভাবে, "কিন্তু আমার বায় আসে।"

অতিথিপরাগণতা

হেয়ার ক. আতিথ্য গ্রহণ করলে, সেই আরগার চোকবার সময় যেমন ছিল, তেমনই অবস্থার তাকে রেখে আসেন; কারণ নিজের উপস্থিতির থাকার সর্বত্র রেখে আসবার প্রবণতাকে তিনি প্রত্যয় দেন না। বরং তিনি চেষ্টা করেন নিজের চাল-চলন সেই আরগার সঙ্গে মানানসই করে তোলবার জন্য; অবশ্য সেজন্য তাঁর উদ্বেগ ব্যর্থ হতে দেন না।

যখন হেয়ার ক. অতিথি আপ্যায়ন করেন তখন তিনি অন্তত একটা চেয়ার কিংবা একটা টেবিল তার আরগা থেকে সরিয়ে রাখেন। "তার কিসে স্থিতি হবে সেটা আমিই ঠিক করব, এবং সেটাই ভাল!" বলেন তিনি।

অচেনা বাড়ীতে হেয়ার ক.

একটা অচেনা বাড়ীতে ঢুকে বিজ্ঞান করতে বাবার আগে হেয়ার ক. সেই বাড়ী থেকে বের হবার পথগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখে নিলেন না। প্রশ্ন করতে অগ্রসর ভাবে উত্তর দিলেন। "ওটা একটা পুরানো অত্যাশ। আমি ব্যায়ের

পকে ; কাজেই আমার থাকবার আরণ্য একটার বেশী বেশ হবার রাত্তা থাকে ভাল ।”

আচরণের প্রকাশ মনোভাব

হেরার ক.-এর কাছে একজন বর্ণন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এসেছিলেন, তিনি হেরার ক.-কে তাঁর জীবনের কথা বলছিলেন । কিছুকণ পরে হেরার ক. তাঁকে বললেন, “তুমি বসেছ অস্বস্তিতে, কথা বলছ অস্বস্তিতে, তুমি ভাবছ অস্বস্তিতে ।” বর্ণন শাস্ত্রের অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, “আমি আমার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইনি, আমি যা বলছি, সেই বক্তব্য ব্যাপারে জানতে চেয়েছি ।” “বক্তব্য বলে কিছু নেই”, বললেন হেরার ক. । “বেখছি তুমি হাতড়ে হাতড়ে চলেছ, বক্তব্যহীন বলে কিছু নেই, তোমার চলা দেখে বুঝছি ; তাই তুমি পৌছবে না । তোমার কথাবার্তা অস্পষ্ট, আর সেই কথাবার্তার কিছুই স্পষ্ট হয় না । তোমার ধারণা বেখে তোমার উদ্দেশ্য লব্ধে আমার কোনো উৎসাহ থাকে না ।”

হেরার ক. যদি একজন মানুষকে ভালবাসতেন

হেরার ক.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “একজন মানুষকে- ভালবাসলে আপনি কী করেন ?” “তার লব্ধে একটা ধারণা করে নিই”, বলেছিলেন হেরার ক., “তারপর চেষ্টা করি যেন একরকম হয় ।” “কী ? ধারণাটা ?” “না, লব্ধবটা”, বলেছিলেন হেরার ক. ।

হেরার ক. এবং সুস্তিচ্ছান

একদিন হেরার ক. তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজনকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“কদিন আগে থেকে একজনের সঙ্গে যেনায়েনা করছি, লোকটি আমার বাড়ির উঠোনে বসে থাকে । এখন তার সঙ্গে যেনায়েনা করার কোনো ইচ্ছা আর আমার নেই ; বাই হোক, তুমি তার সঙ্গে যেনায়েনা করার একটা কারণও বুঝে পাচ্ছি না, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছুঁকিয়ে দেবারও না । এবার আমি জানতে পেরেছি যে সেই ছোট্ট বাড়িটা, বেটা সে একদিন ভাঙা করে ছিল, বেটা কিনে নিয়েই আমাদের লালসাহটা বাড়িয়ে কেলেছে । কারণ তাঁর অন্য জানালা দিয়ে আসে। ছুঁতে পারত না, যদিও বলভলে

সবে আধপাকা হয়ে উঠেছিল। এটাকে কি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার কারণ বলে মনে করতে পারি, অন্ততপক্ষে ওপর ওপর কিবা ভেতরে ভেতরে ?” এর কবিন পরে হেরার ক. তাঁর বন্ধুকে বললেন, “আমি এবার লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি ; ভেবে দেখুন একবার, বেশ কয়েক মাস ধরে তার সেই আগের বাড়িওয়ালা চোঁটা করছিল ঐ গাছটা কেটে ফেলতে। কেমনা ওটার জন্য জানালা দিয়ে আলো ঢুকতে পারত না। সে কিন্তু তা হতে দেরনি, কারণ সে সেই কলগুলোর আশায় ছিল। আর এখন, যেমনি বাড়িটা আমার এই লোকটার হাতে এল, ওরমি সে সেই গাছটা সত্যিসত্যিই কাটিয়ে ফেলল, গাছ ভরতি আধপাকা হল ! তার এই যুক্তি-বিরোধী আচরণের জন্য আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি।”

ভাবনার শিষ্ণুত্ব

হেরার ক.-কে অজ্ঞাযোগ করা হয়, তাঁর কাছে নাকি ইচ্ছা অত্যন্ত বেশীর ভাগ সময়ই ভাবনার উৎস। হেরার ক. উত্তর করেন, “এমন ভাবনা কখনই আসেনি যার মূলে কোনো ইচ্ছা ছিল না। কোন ইচ্ছা—একমাত্র সেই বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। শিষ্ণুত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন বলে সংশয় প্রকাশ করবার জন্য সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে না যে একটি শিষ্ণু আহোঁ কোনো পিতা থাকতে পারে।”

মৌলিকতা

হেরার ক. টিপ্সনী করেন, আজকাল অনেক সময় দেখা যায়, লোকেরা সাধারণ্যে বড়াই করে বেড়ায়, সম্পূর্ণ একাকী বিশাল বিশাল বই লিখে ফেলতে পারে ; আর, সকলে তা মেনেও নেয়। চীন দেশের দার্শনিক জুয়াং হুসি পরিণত বয়সে এক লক্ষ শব্দের এক বই লেখেন, তার দশভাগের নয় ভাগই ছিল উদ্ধৃতি। আমাদের এখানে আর এজাতীয় বই লেখা চয় না, মেধার অভাব। তার কলে ভাবনা-চিন্তা কেবলমাত্র নিজের কারখানাতেই তৈরী হয়, কলে যে তার থেকে কখনো কৃত্তিৎ দেখাতে না পারে তাকে ধারাপ মনে হয়। কাজেই তখন আর এমন ভাবনা থাকে না বা গ্রহণ করা যায়, কোনো ভাবনাকে বিন্যস্তও করা যায় না, বা উদ্ধৃত করা যায়। এদের কাজের জন্ত কত সামান্য প্রয়োজন ! একটা কলম আর কিছু কাগজ তাদের একমাত্র সম্বল ! আর, কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই, শুধু ঐ সামান্য সম্পদ, বা একজন মাত্র লোক হাতে বয়ে

নিত্যে পারে, তাই দিবে তারা তাদের কুঁড়েঘর বানায় ! বড় বড় প্রাঙ্গণ তারা
সেমে মা, কলে জামে মা, ওসব একা একজন বানাতে পারে ।

প্রতিষ্ঠা

একজন অভিনেত্রীকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে হেয়ার ক. বলেছিলেন, “বেথতে
হুন্দর ।” তাঁর সঙ্গী তখন বলে, “বেথতে হুন্দর বলে মহিলাটি ইহা নীঃ
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ।” হেয়ার ক. বিরক্ত হয়ে বলেন, “বেরেটি প্রতিষ্ঠা লাভ
করেছে বলে হুন্দর ।”

“বখলকারটা তখন”—এর ব্যাখ্যাত প্রসঙ্গে

একবার বলতে গেলে অপরিচিত লোকের বাড়িতে অতিথি অবস্থার
হেয়ার ক. লক্ষ্য করেন যে তাঁর আশ্রয়দাতারা শোবার ঘরের বিছানা থেকে
বেশা ঘর এমন এক কোণের একটা ছোট টেবিলের ওপর সন্ধ্যার খাবারের
বাসন-পত্র সাজিয়ে রেখেছে । তাঁর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে রাখতে তাঁর
আশ্রয়দাতারা ব্যস্ত হয়েছিল মনে করে প্রথমে মনে মনে প্রশংসা করে তিনি
ভাবতে শুরু করলেন, তিনি নিজেও রাতে শুতে বাবার আগে সন্ধ্যার
খাবারের বাসন-পত্র গুছিয়ে রাখতেন কিনা । বেশ কিছু ভাবনা চিন্তা করে
ঠিক করলেন, সঠিক সময়ে কাজ করাই ঠিক । তেমনি ঠিক মনে হল তাঁর, যে
অন্য লোকেও কখনো কখনো এই সমস্তা নিয়ে কিছুকণ ব্যস্ত থাকে ।

হেয়ার ক. এবং বেড়ালগুলো

হেয়ার ক. বেড়াল ভালবাসতেন না । তাঁর কাছে ওগুলো মাকড়সের বন্ধু বলে
মনে হতো না, তাই তিনিও ওহের বন্ধু নন । “আমাদের যদি একই উদ্দেশ্য
থাকত”, তিনি বলতেন, “তাহলে ওহের বিরোধী আচরণে আমার কিছু
বেত আসত না ।” আবার একান্ত অনিচ্ছাসম্মেই তিনি তাঁর চেয়ারের ওপর
থেকে বেড়াল তাকাতে । “বিজ্ঞান করাও একটা কাজ”, বলেন তিনি ;
“ওটা সকল হোক ।” এমন কি যখন বেড়ালগুলো তাঁর দরজার সামনে
টোকায়েচি করত, তখন শীতের মধ্যেও উঠে গিয়ে দরজা খুলে ওগুলোকে গরম
ঘরে ঢুকতে দিতেন । “ওহের হিসেব সোজা”, তিনি বলেন, “ডাকলে দরজা
খুলে দেয় । দরজা খুলে না হিলে ওরা আর ডাকে না । ডাকা উন্নতির
প্রতীক ।”

হেয়ার ক.-এর প্রিয় জন্ম

কোন জন্মকে তিনি সবচেয়ে বেশী মূল্য দেন জিজ্ঞাসা করতে. হেয়ার ক. হাতির মাংস করেন এবং তার কারণ হিসেবে বলেন : হাতি বুদ্ধির সঙ্গে শক্তির বিজয় ঘটায়।' কাউকে জানতে না দিয়ে উৎসীড়ন এড়িয়ে বাবার বা খাত সংগ্রহ করবার দীর্ঘ বুদ্ধি নয়, সেই বুদ্ধি, যার সাহায্যে বড় কাজের জন্য শক্তির ব্যবহার হয়। এই জন্মের অবস্থান কেবল প্রসঙ্গ চিহ্ন থাকে। তাছাড়া এরা ভাল প্রকৃতির এবং তাবাসা বোকে। এরা বড় হিসেবে ভাল, শক্ত হিসেবেও। বিশাল আকৃতির এবং ভারী তবুও বেশ ক্ষুদ্রগতি। ওদের ভাঁড় দিয়ে ক্ষুদ্রতম খাতও এক বিশাল চেহারাকে যোগায়, বাহ্যিক অবধি। ওদের কাঁচ নিয়ন্ত্রিত করা যায় : একমাত্র পছন্দসই হলে শোনে। এরা বাঁজও বহুকাল। এরা মিতকও এবং তা কেবলমাত্র হাতিদের সঙ্গেই নয়। সর্বত্র ভালবাসা পায় আবার সবাই এদের ভয়ও পায়। এক বিশেষ কৌতুক মজার ভাৱে এমন করা হয়েছে যে এরা সম্বন্ধিত হতে পারে। এদের চামড়া মোটা, সেখানে ছুরি ভেঙে যায় ; তবে এদের প্রকৃতি নয়। এরা দুঃখিত হতে পারে। এরা ক্রুদ্ধ হতে পারে। নাচতে ভালবাসে, যারা যায় জ্বলে। এরা শিকারের এবং অন্য ছোট জন্মদের ভালবাসে। এদের রঙ ধূসর এবং শুষ্ক বিশাল আকৃতির জন্য নজরে পড়ে। এদের খাওয়া যায় না। খুব কাজের। হারা পান করতে ভালবাসে এবং খুশী হয়। শিল্পের জন্য এরা কিছু করে—হাতির দাঁত সরবরাহ করে।

প্রাচীনতা

শিল্পী লুওস্টোম-এর আঁকা কিছু জলের পাত্রের এক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হেয়ার ক. বলেছিলেন, “প্রাচীনকালের এক ছবি, বর্বর যুগের ছবি! সে সময়ে মানুষের বোধের কিছুই তফাৎ বুঝতো না, গোলটা গোল মনে হতো না, ছুঁচোমোটা ছুঁচোমো নয়। শিল্পীদের এটা আবার ঠিক করতে হবে এবং ঝরিকারকে সঠিক, স্পষ্ট, প্রকৃত আকৃতির কিছু দেখাতে হবে ; তারা এত অস্পষ্ট, ভাল-ভাল, সন্দেহজনক বস্তু দেখেছে; তারা নিঃসুখতার জন্ম এমন তৃপ্ত ছিল, যে যদি কেউ তার পাগলারি মেনে নিতে না দিত তাহলে তারা তাকে কবেই অভিসম্বিত করত। এই ছবি দেখলেই বোকা যায়, কাজটা অনেকের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। যারা আকৃতি ঠিক করে দিয়েছে তারা বস্তুর

উপরবাসিত। নতুন ভাবে; এই পাঁজটা থেকে জল ঢালা অসম্ভব। সে সময়ে কিন্তু প্রচুর মানুষ ছিল, যাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া মনে করা হত। সেই ব্যাপারেও শিল্পীদের বিরোধিতা করতে হতো। এক বর্ষর যুগ, প্রাচীনতা!” হেরার ক.-কে খেয়াল করিয়ে দেয়া হয়েছিল, যে ছবিটা বর্তমান কালে ঝাঁক। “হ্যাঁ”, ডঃখের সঙ্গে বলেছিলেন হেরার ক., “প্রাচীন কালের।”

বিচার-ব্যবস্থা

প্রাচীন চীন দেশের একটি কাহ্ননকে হেরার ক প্রায়ই বিশেষ ভাবে আদর্শ বলে বলতেন। সেই কাহ্নন অহুনায়ে বড় বড় বায়লার জন্য বিচারকদের আনা হতো বহুদূরের দেশ থেকে। ফলে তাদের ওপর খুব দিবে প্রভাব বিস্তার করা অনেক বেশী কঠিন হতো (এবং সেইজন্য খুষের সাহায্যে কম প্রভাবিত হতো), কারণ স্থানীয় বিচারকরা সেদিকে নজর রাখত। অর্থাৎ সেইসব লোক নজর রাখত, যারা বিশেষ করে এই ব্যাপারের সব উপায় জানত এবং বহিরাগতদের কতি করবার চেষ্টা করত। তাছাড়া এইসব আয়বানী করা বিচারকরা বৈষম্যনিমিত্ত অভিযুক্ততার মাধ্যমে স্থানীয় বিধি ব্যবহার ব্যাপারগুলি জানতো না। মেক প্রতিনিরত ঘটনার মাধ্যমে অন্যার প্রায়ই সত্যের চরিত্র কলুণিত করে। নতুনদেরা সব নতুন করে বিবৃত করতে বাধ্য করত; যার ফলে তারা লক্ষণীয় বিষয়গুলি বেছে নিত। শেষকালে তারা নিরপেক্ষ নীতির কারণে কৃতজ্ঞতা, শিশুর প্রতি মমতা, অতি পরিচিত ব্যক্তির নির্দোষিতা ইত্যাদি ছুঁ করতে বাধ্য হতো না কিংবা এতটা সাহস পেত, যে সেই পরিবেশে শত্রু বৃদ্ধি করতে পারত।

একটি সুন্দর উত্তর

একজন অতি দরিদ্রকে আদালতে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে প্রচলিত নপথ গ্রহণ করবে, না সীর্জার নপথ। সে উত্তর করেছিল, “আমি বেকার।” “এটা তুমি আজ অন্যমনস্কতা নয়”, বলেছিলেন হেরার ক.। “এই উত্তরের মাধ্যমে সে জানিয়ে দিয়েছিল, যে সে এমন একটা অবস্থার কাছে, যেখানে এইসব প্রশ্ন এমনকি হয়তো সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থাই অর্থহীন।”

কর্মের ইতিহাসের ওপর লেখা একটা বই পড়বার পর হেয়ার ক. বার্ষিকের প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করে বলেছিলেন সবকিছু মূলত অপরিচিত করে তোলবার জন্য। “কোনো রকম পড়াশুনা না করেই সফিটের দায়িত্ব হয়েছিল, তারা অনেক কিছু জানে”, তিনি বলেছিলেন, “তখন সফিট সংক্ৰেটিস এগিয়ে এলেন তাৎ উক্ত উক্তি নিয়ে।” তিনি জানেন যে তিনি কিছুই জানেন না। আশা করা যেত তিনি তাঁর কথা শেষ করবেন : কারণ আমিও সোনারকম পড়াশুনা করিনি। (কিছু জ্ঞানতে হলে আমাদের পড়াশুনা করতে হবে।) কিছু মনে হচ্ছে তিনি আর কিছু বলে নান, আর হয়তো তাঁর প্রথম কথার পরে প্রচণ্ড হাততানি ফেটে পড়ে ছুঁড়ার বছর ধরে চলেছিল, কলে পরবর্তী প্রত্যেক সপ্তাহকে চাপা পড়ে ছিল।”

রাষ্ট্রদূত

একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত, হেয়ার এক প্রসঙ্গে কবিন আগে হেয়ার ক.-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। নোটি আমাদের দেশে তার দেশের বিশেষ আদেশ অনুসারে কাজ করেছিল এবং তার দেশে ফেরবার পর, আমরা দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম, তার বিরুদ্ধে কঠিন গান্ধা নেয়া হয়েছিল, যদিও সে তার কাজ বিশেষ সাক্ষ্যের সঙ্গে শেষ করে দিয়েছিল। “তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে তার প্রতি আদেশ প্রতিপালন করতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধ বৈধি মিশেছিল”, আমি বলেছিলাম। “আপনার কি ধারণা, সেই রকম আচরণ না করলে সে সফল হতে পারত ?”—“অবশ্যই পারত না”, বলেছিলেন হেয়ার ক., “তাকে ভাল খাওয়া দাওয়া করতে হয়েছে যাতে সে তার শত্রুদের সঙ্গে একটা রকম আসতে পারে, তাকে দুঃস্বপ্নকারীদের প্রভাব দিতে হয়েছে, নিজের দৃষ্টিকে নিয়ে তামাশা করতে হয়েছে যাতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।”—“তাহলে তো সে ঠিকই করেছিল ?” আমি প্রশ্ন করেছিলাম। “হ্যাঁ, নিশ্চয়”, বলেছিলেন হেয়ার ক. অন্যমনস্ক ভাবে। “সে ঠিকই করেছিল।” এই বলে হেয়ার ক. চলে যাক্ষিলেন। আমি বাহোক তাঁর হাত ধরে কিরিয়ে এনেছিলাম। “তাহলে তাকে দেশে ফেরবার পর এরকম দুঃস্বপ্ন ফেলা হল কেন ?” আমি আহত হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। “তার বোধহয় ভাল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছিল, দুঃস্বপ্নকারীদের সঙ্গে বেলামেশা

চালিয়ে গেছিল আর তার বিচার সম্বন্ধজনক হয়ে পড়েছিল”, হেয়ার ক. বলেছিলেন নিরাপত্তা ভাবে, “আর তাই ওদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।” “আর সেটা আপনার হতে ওরা ঠিকট করেছিল?” প্রশ্ন করেছিলেন কতাপভাবে।—‘হ্যাঁ, নিশ্চয়, নইলে আর কী করতে পারত ওরা?’ হেয়ার ক. বলেছিলেন। “বৃত্তা অবস্ফুটাবী কেনেও একটা কাজ নেবার সাহস তার ছিল, এবং তার ফলও। কাজেই সে হয়েছে। ওরা তখন তাকে কবর না দিয়ে আর কী করতে পারত? তাকে হাওয়ার কুলিয়ে রেখে পচতে দিত আর সেই দুর্গন্ধ সহ্য করত?”

স্বাভাবিক সম্পত্তির আগ্রহ

আলোচনা প্রসঙ্গে যখন একজন সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করে তখন হেয়ার ক. প্রাচীন উপজাতীয় রেলদের এই কাহিনী শোনান। আটসলাগের দক্ষিণ উপকূলে কিছু দূরে আছে, তারা সেখানকার উপসাগর শক্ত করে নৌদর-দেয়া বন্দা দিয়ে ভাগ করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এইসব জল-জমির প্রতি তাদের আকর্ষণ নিজেদের সম্পত্তির চেয়ে বেশী। তারা নিজেদের ওরই একটা অংশ বলে মনে করে। যখন ওগুলোর মধ্যে আঁধা মাছ পাওয়া যায় না, তখনও ওরা হাল ছাড়ে না আর বন্দরের যেসব লোকের কাছে তারা তাদের মাছ বিক্রি করে তাদের শাপ-শাপাঙ্গি করে, কারণ তারা ওদের কাছে হেসে আসা সৃষ্টিছাড়া এক জাত বলে মনে হয়। তারা নিজেদের জলের মালিক বলে জানে। যখন তারা বড় কোনো মাছ ধরে তখন সেটা তারা জলার মধ্যে রেখে দেয়, তার নাম দেয় আর সেটাকে নিজেদের সম্পত্তির চেয়ে বেশী ভালবাসে। কিছুকাল যাবৎ ওদের আর্থিক অবস্থার নাকি অবনতি হয়েছে, তবুও তারা যাবতীয় উন্নতির প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে, তার ফলে বেশ কয়েকটি সরকারকে তারা ভেঙে দিয়েছে, যেগুলো তাদের আচার-ব্যবহারকে অবহেলা করেছিল। এইসব জেলেরা অস্বাভাবিক প্রমাণ করেছে সম্পত্তির আগ্রহের শক্তি। এটা মহা-জাতির প্রকৃতিবৃত্ত এক বৈশিষ্ট্য।

হাঙররা যদি মানুষ হতো

“হাঙররা যদি মানুষ হতো”, বাচ্চা যেয়েটা প্রশ্ন করেছিল তাদের ভাড়াটে হেয়ার ক.-কে, “তাহলে কি তারা ছোট ছোট মাছদের সাথে আরো ভাল

ব্যবহার করত ?” “নিশ্চয়”, তিনি বলেছিলেন। “হাঙররা যদি মানুষ হতো তাহলে তারা সমুদ্রের ছোট ছোট মাছগুলোর জন্য মজবুত সব খাঁচা বানাতো—আর সেসব খাঁচার আশ্রয়, নিরাশ্রয় সব রকম খাতের ব্যবহার থাকতো। খাঁচাগুলোর মধ্যে জল বাতে সব সময়ে টাইকা থাকে আর অল্প সব ব্যবহার বাতে পুরোপুরি স্বাস্থ্যসম্মত হয় সেদিকেও তারা নজর রাখতো। কোনো মাছের পাখনা একটু আধটু ছড়ে গেলে ততক্ষণ সেখানে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হতো, যাতে সে কোনোক্রমেই হাঙরদের এড়িয়ে আগে-ভাগে মরে না যায়। তাছাড়া মাছগুলো যাতে মন-মরা হয়ে না থাকে তার জন্যও মাঝে মধ্যে জলের তলে ঘটা করে উৎসব করা হতো। কারণ, আনন্দ উজ্জল মাছ মুখে পড়া মাছের চেয়ে খেতে ভাল। সেই সব বড় বড় খাঁচার মধ্যে অবশুই পাঠশালাও থাকতো। এই সব পাঠশালার কচি কচি মাছেদের দেখানো হতো কিভাবে সীতার কেটে হাঙরদের গহ্বরে ঢুকতে হয়। সেখানে তাদের অতি অবশু ভুগোলও পড়ানো হতো। বড় কোনো হাঙর হয়তো আলসেমি করে কোথাও একটা শুয়ে আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে তো। তবে কচি কচি মাছেদের মনের উন্নতির দিকেই সবচেয়ে বেশী নজর দেয়া হতো আর বোকানো হতো, একটা মাছের পক্ষে সানন্দে আত্মোৎসর্গ করার চেয়ে মহৎ এবং বীরত্বপূর্ণ কাজ আর কিছুই নেই। মাছেদের পক্ষেও অবশু হাঙরদের সব কথা বিশ্বাস করাটাই বাঞ্ছনীয় হতো, বিশেষ করে যখন হাঙররা ছোট ছোট মাছদের এক উজ্জল ভবিষ্যতের আশ্বাস দিত। সুবোধ-সুশীল ভাবে এসব মানলেই সেই ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার হবে, মাছেদের মনে এই বিশ্বাসও জাগানো হতো। যাবতীয় চীন, বাতন, আক্সচেতন এবং মার্কসীয় ভাবনা থেকে দূরে থাকাকি যে মাছদের পক্ষে হিতকর, এ কণাও তাদের বোকানো হতো। তাদের মধ্যে কারো কখনো ঐরকম কোনো মনোবৃত্তির আভাস প্রকাশ পেলেই সেকথা হাঙরদের কানে পৌঁছে দেওয়াটা তাদের কর্তব্য হতো। যদি হাঙররা মানুষ হতো, তাহলে তারা স্বভাবতই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করত, বিদেশী মাছের বসতি আর বিদেশী মাছ জয় করে আশ্রয় করত। সেইসব যুদ্ধ করতে হাঙররা অবশুই মাছেদের পাঠাতো। তারা মাছেদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিত যে ঐসব বিদেশী মাছেদের সঙ্গে তাদের কেমন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সবাই জানে মাছেরা নির্বাক। কিন্তু তাদের বুঝিয়ে দেয়া হতো যে ছ-দল মাছ সম্পূর্ণ দ্বিধা ভাবার নির্বাক, যখন পরস্পরের

বক্তব্য তাদের পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব। এইসব বুঝে কোনো বাহ্যিক শত্রুপক্ষের কিছু ভিন্ন ভাষায় নির্বাক খাচ হারতে পারলে তাকে সামুদ্রিক উদ্ভিদ হিসেবে ভৈরী পদক দিয়ে সম্মানিত করা হতো আর বীর আখ্যা দেয়া হতো। হাঙররা যদি বাতুল হতো তাহলে স্বভাবতই তাদের একটা শিল্প চেতনা থাকতো। স্বাক্ষর স্বাক্ষর সব চিহ্ন থাকতো—সেসব চিহ্নিতে হাঙরদের দীর্ঘকালো সব চরমকার রঙে আঁকা থাকতো, আর তাদের মুখ-গল্বের আঁকা হতো, যেন যমোরস অগোষ্ঠান—সেখানে মনের স্তবে তাড়-পা চড়িয়ে আনন্দ করা যায়। সমুদ্র-তলেব সেট কপালের নাটকে দেখানো হতো সাহসী, বীর মাছেরা কেমন আনন্দ উজ্জল অবস্থায় হাঙরদের মুখ-গল্বের গিয়ে ঢুকছে। সেট সঙ্গে বাজনা এমনই মন মাদানো ততো যে তাব মর্দনার প্রভাবে মাছেরা বাস্তকারের আগে আগে, বিচোর অবস্থায়, চরম আনন্দে তাড়বদের মুখ-গল্বের দিকে ছুটতো। তাড়বরা মাছুষ তলে তাদের মধ্যে একটা ধর্মও থাকতো। সেট ধর্মের পার্টে বলা ততো যে মৎস্যজীবনের সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে তাড়বেরই চুঠবে। হাঙররা মাছুষ তলে কিন্তু মাছেদের গণতে এমন যমুন আছে, অর্থাৎ সব মাছই যমুন, যেমন আর থাকতো না। তাদের মধ্যে কিছু মাছ দলবেব তাব পেত, আর তাদের লম্বীনে থাকতো অন্য মাছেরা। এইসব মাছেদের মধ্যে যারা এটু আদর্শ বড়, তারা ছোটদের খেয়ে ফেলবার অধিকারও পেত। এতে হাঙরদের কেমন সুবিধাট হতো। কারণ তাহলে তারা আরো বেশী বড় মাছ খেতে পেত। আর, এইসব গুপ্ততলার মাছেরা—অর্থাৎ পিঙ্ক, অফিসার, খাঁচা বানাবার এলিনীয়ার, প্রমুখেরা অন্যান্য মাছেদের মধ্যে মৃৎখলাব ব্যবহার দিকে নজর রাখতো। এক কথায়, হাঙররা যদি বাতুল হতো, তাহলেই সমুদ্রের তলে সবসময় সংকুতির বিকাশ ঘটতো।”

(অহুবাধ : আকশি সেন)

প্রশংসা

হেয়ার ক. বখন সুনাম, পুরাণো ছাড়াই তাঁর প্রশংসা করছে, তখন তিনি বলেছিলেন, “ছাড়াই মাস্টার মশাই-এর ঘোষণাও অনেক কাল আগে কুলে যাবার পর তিনি নিজে সেগুলোর কথা ভাবেন।”

কিন্তু একটার জন্য হেয়ার ক. একটা দিন অপেক্ষা করেছিলেন, তারপর একটা সপ্তাহ, তারপর আরো একটা মাস। অবশেষে তিনি বলেছিলেন, “একটা মাস আমি অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু এই দিনটা বা সপ্তাহটা নয়।”

উদ্দেশ্য সাধক

হেয়ার ক. এই প্রশ্নগুলো করেছিল :

“প্রত্যেক দিন সকালে আমার প্রাতিবেশী গ্রামোফোন বাজে বাজনা বাজায়। কেন বাজনা বাজায়? তান, সে ব্যাখ্যা করে বলে। কেন ব্যাখ্যা করে? কারণ তার শক্তি ধরকার, শুনতে পাই। কি জন্য তার শক্তি ধরকার? কারণ তাকে শহরে তার স্বত শক্তি আছে তাদের হারিয়ে দিতে হবে, সে বলে। শক্তিধর কেন হারাতে হবে? কারণ সে খেতে চায়, শুন।”

হেয়ার ক. যখন শুনলেন, তাঁর প্রাতিবেশী বাজনা বাজায় ব্যাখ্যা করার জন্য, ব্যাখ্যা করে শক্তিশালী হবার জন্য, শক্তিশালী হতে চায় শক্তিধর নিপাত করবার জন্য, নিপাত করতে চায় খাবার জন্য, তখন তিনি তাঁর প্রশ্ন করেছিলেন, “সে খায় কেন?”

অন্যায় ভাবে প্রভাবিত না হওয়ার চাকুরী

হেয়ার ক. একজন ব্যবসায়ীর কাছে একজনের সুপারিশ করেছিলেন তার অন্যায় ভাবে প্রভাবিত না-হওয়া চরিত্রের জন্য। দু সপ্তাহ পরে সেই ব্যবসায়ী আবার হেয়ার ক.-এর কাছে এসে ডিজালা করেছিল, “অন্যায় ভাবে প্রভাবিত না-হওয়া চরিত্র বলতে তুমি কী বুঝেছ?” হেয়ার ক. বলেছিলেন, “আমি যদি বলি, যে লোকটাকে তুমি চাকরি দেবে, সে অন্যায় ভাবে প্রভাবিত হয় না, তার অর্থ আমি বলতে চাই, তুমি গুরু ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।” “তাই”, ব্যবসায়ীটি বলেছিল আহত হয়ে, “এখন আমার আশঙ্কা করবার কারণ আছে যে তোমার লোকটি আমার শক্তির ধারাও প্রভাবিত হয়।” “তা আমি জানি না”, বলেছিলেন হেয়ার ক. নিরাসক্ত ভাবে। “আমার কিন্তু”, চেঁচিয়ে উঠেছিল সেই ব্যবসায়ী তিক্ত

ভাবে, “সব সময়ে মন বুগিয়ে চলে, অর্থাৎ আমার খারাপ সে প্রভাবিত হয়।”
 হেয়ার ক. অলসভাবে মুচকি হেসেছিলেন। “আমার খারাপ সে প্রভাবিত
 হয় না”, তিনি বলেছিলেন।

দেশপ্রেম, দেশবাসীর প্রতি স্থপা

কোনো এক বিশেষ দেশে বাস করা হেয়ার ক. প্রয়োজনীয় মনে করতেন
 না। তিনি বলতেন, “সর্বত্রই আমি অতৃপ্ত থাকতে পারি।” কিন্তু একদিন
 তিনি একটা শহরের পথ ধরে যাচ্ছিলেন, সেই শহর তখন সেদেশের শত্রুদের
 অধীনে, অর্থাৎ যে দেশে তিনি বাস করতেন। তখন শত্রুদের একজন
 অফিসার তাঁর মুখোমুখি এগিয়ে আসে এবং তাঁকে পথ ছেড়ে নেমে যেতে বাধ্য
 করে। হেয়ার ক. পথ ছেড়ে নেমে গিয়ে বৃকতে পারলেন, সেই লোকটির
 ব্যবহারে তিনি আহত, এবং শুধু সেই লোকটির প্রতিই বিরক্ত নন, বিশেষ
 করে সেই দেশের প্রতি যে দেশের লোক সেই অফিসারটি, কলে তিনি প্রার্থনা
 করছিলেন, যেন সেই দেশ ভূপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস হয়ে যায়। “কেমন করে”,
 হেয়ার ক. প্রশ্ন করেছিলেন, “আমি মেই সময়টুকুর জন্য ন্যাশনালিষ্ট হয়ে
 পড়েছিলাম? একজন ন্যাশনালিষ্ট-এর সংস্পর্শে এসে। কিন্তু সেইজন্য
 বোকারমিকে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে, কারণ তাঁর সংস্পর্শে এলে লোকে
 বোকা হয়।”

অতৃপ্ত থাক।

দেশ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে হেয়ার ক. বলেছিলেন, “সর্বত্রই আমি অতৃপ্ত
 থাকতে পারি।” একজন মনবোধী শ্রোতা এবার তাঁকে প্রশ্ন করে, এমন
 কথা আসে কোথা থেকে যে তিনি বলেন, তিনি অতৃপ্ত থাকেন, যদিও
 প্রকৃতপক্ষে তাঁর খাদ্য আছে। সেই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে হেয়ার ক.
 বলেন, “খুব সম্ভব আমি বলতে চেয়েছিলাম, বাস করতে চাইলে আমি সর্বত্র
 বাস করতে পারি, যেখানে খাদ্যাভাব চলছে। আমি বীকার করছি যে
 আমি নিজে অতৃপ্ত আছি এবং এমন দেশে বাস করছি যেখানে খাদ্যাভাব
 চলছে, এটাই দুই বস্তুবোনের মধ্যে তফাৎ অনেক। কিন্তু হুক্তি হিসেবে আমি
 বোধহয় বলতে পারি, আমার কাছে যেখানে খাদ্যাভাব চলছে সেখানে বাস
 করা যদিও অতৃপ্ত থাকার মত ধারণা নয়, তবে অন্ততপক্ষে অবশ্যই খুব

বারাণ। অন্যের কাছে আমার অতুল্য খাটো। তেমন বিশেষ কিছু না হতে পারে, কিন্তু একথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে আমি খাদ্যাভাব চলার বিকল্পে।”

প্রস্তাব না মানলে প্রস্তাব

হেয়ার ক. পরামর্শ দিয়েছিলেন, সম্ভব হলেই প্রতিটি প্রস্তাবের সঙ্গে অতঃসূর্তভাবে আরও একটি প্রস্তাব রাখা, যদি প্রথম প্রস্তাব না মানা হয় সেইজন্য। তিনি যেমন একজনকে—লোকটা ছুরবহার পড়েছিল—একটা বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেটা অন্যদের খালাসত্ত্ব কয় কতির কারণ হতে পারত, তবে তাকে আরও একটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, কম ক্ষতিকারক তবে সম্পূর্ণ রকম বেপরোয়া নয়। “যে সব পারে না”, তিনি বলেছিলেন, “তার বেলায় সামান্য কিছুও বাধ রাখতে নেই।”

অপরিহার্য অফিসার

একজন অফিসার বেশ কিছুকাল যাবত তাঁর দপ্তরের কাজ চালাচ্ছিলেন। হেয়ার ক. তাঁর খুব প্রশংসা শুনেছিলেন, তিনি এত ভাল অফিসার যে তিনি অফিসের কাজে অপরিহার্য। “তিনি অপরিহার্য কেন?” প্রশ্ন করেছিলেন হেয়ার ক. বিরক্তভাবে। “ওঁকে ছাড়া অফিসের কাজ অচল হয়ে পড়বে”, বলেছিল তাঁর প্রশংসাকারী। “তাহলে আর তিনি কেমন ভাল অফিসার, যদি ওঁকে ছাড়া অফিসই অচল হয়ে পড়ে?” বলেছিলেন হেয়ার ক., “তাঁর অফিসের কাজকর্ম গোছাবার মত যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন, যাতে তাঁর অল্পপন্থিতিতেও অফিস চলতে পারে। কী কাজটা করেন তিনি আসলে? আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, কাজ করেন ভয় দেখানোর!”

সন্তোষজনক প্রশ্ন

“আমি লক্ষ্য করেছি”, বলছিলেন হেয়ার ক., “আমরা অনেকটা আমাদের শিকার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাই না, কারণ আমরা সব প্রয়েরই একটা করে উত্তর জানি। প্রচারের সুবিধার জন্য যেসব প্রয়ের যীমানা হয়নি বলে মনে হয়, আমরা তার একটা লিস্ট তৈরী করতে পারি না?”

ଝୋଟେର ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟା

“କী କାଜ କରନ୍ତେ ?” ଡେରାର କ-କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରା ହେଉଛି । ଡେରାର କ. ଉଦ୍ଧର
ବିସେଇଲେ, “ବେଶ ଅନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟାର ମଡେଲି, ମରବତୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି ଚାଲାଇଛି ।”

ନହନୀର ଅପମାନ

ଡେରାର କ.-ଏକ ନହନୀ ନହନ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ଆନା ହେଉଛି, ଯେ ତୀର ନହନ୍ତେ
ଅନୁପାଳନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି । “ହଁ, ତବେ ଏକମାତ୍ର ଆମାର ମେଲେ”, ଏହି ବଳେ
ଡେରାର କ. ତାର ବିରୁଦ୍ଧର ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରେଇଲେ ।

ଦୁଇ ନହର

ଡେରାର କ. ଏ-ନହରର ବଳେ ବି-ନହର ବେଢେ ନିସେଇଲେ । “ଏ-ନହରେ”, ଡିନି
ବଲେଇଲେ, “ଲୋକେ ଆମାକେ ଭାଲବାସେ, କିନ୍ତୁ ବି-ନହରେ ଲୋକେ ଆମାର ପ୍ରୀତି
ବଦ୍ଧତାବାପନ । ଏ-ନହରେ ଆମାକେ କାନ୍ଦେ ଲାଗାନୋ ହତୋ, କିନ୍ତୁ ବି-ନହରେ
ଆମାକେ ହରକାନ୍ତି । ଏ-ନହରେ ଆମାକେ ଧାରୀ ଟେବିଲେ ଡାକା ହତୋ, କିନ୍ତୁ
ବି-ନହରେ ଆମାକେ ଡେଲେଲେ ନିସେ ଡାଞ୍ଜରା ହତୋ ।”

ମୁଲ୍ୟମିତ୍ତ

ଏକଜନ ଡେରାର କ.-ଏକ ମାଧ୍ୟେ ବହକାଳ ମରେ ସେବା ହଲେ ଏହି ବଳେ ଅଭିଯୋଗ
ଆନା : “ଆମାର ଆଦୌ କୋନୋ ମରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନି ।” “ଓ !” ବଳେ ଡେରାର କ.
ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେ ମେଇଲେ ।

